

প্রত্যয়

অন্নদাশঙ্কর রায়



ডি. এম. লাইব্রেরী
•৪২, কন ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা ।
এ গ্রন্থের কপিরাইট শ্রীমতী লীলা রায়ের

মূল্য দেড় টাকা

১৩৫৮

৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে ত্রিগোপাললাল
মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬, বাণী-প্রসঙ্গের পক্ষে
শ্রীমুকুন্দর চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ।



সূচী

গান্ধীজীর সংগ্রাম	৬
মড়ার উপর খাড়ার ঘা	৬
৩০শে জাম্ময়ারী	৯
বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা	১১
বাস্তববাদী	১৬
আমরা তা হলে কী করব	২৪
আমি কী বিশ্বাস করি ও করিনে		...	৩৩
সংশয়বাদী	৩৯
দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম	৪৬
চিড়িয়াখানা	৫০
পনেরোই অগাস্ট	৬১
গান্ধীজন্ম	৭৩
জমি কার	৮৩
হাতীর খোরাক	৯০

“বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা”র রচনাকাল ১৯৫০।

**অন্নদাশঙ্কর দাস
অন্যায় প্রবন্ধের বই**

তারুণ্য
আমরা
জীবনশিল্পী
ইশারা
বিহীন বই
জীবনকাটি
দেশকালপাত্র

ভ্রমণের বই

পথে প্রবাসে
ইউরোপের চিঠি

কাজী আবদুল ওহুদ সাহেব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ
এক ও অভিন্ন।

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ
অহিংস।

অন্নদাশঙ্কর রায়

৩০শে বৈশাখ ১৩৫৮

159

গান্ধীজীর সংগ্রাম

গান্ধীপরিচালিত সংগ্রাম ছিল একই সঙ্গে দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধে। একটার নাম তো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, অপরটার নাম সব দেশের ও সব কালের সমরবাদ। প্রথমটাকে তিনি ভারতছাড়া করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়টাকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলেন। তাঁর সহযোগীরা শাসনবস্ত্রের ভার পেয়ে দেখলেন সমরবস্ত্রের সাহায্য বিনা শান্তিরক্ষা সম্ভব নয়। দেশরক্ষা তো নয়ই। এ কথা যদি সত্য হয় তবে সমরবাদ এ দেশে চিরস্থায়ী হতে বাধ্য। কিন্তু গান্ধীজী এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। যার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সেই যদি চিরস্থায়ী হয় তবে সংগ্রাম বুথা।

সহযোগীরা যখন দিল্লীর সিংহাসনে তিনি তখন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সমরবস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে প্রমাণ করতে। নোয়াখালী থেকে বিহার, বিহার থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লী, যেখানেই যান সেখানেই তাঁর একমাত্র ধ্যান কী করে তিনি প্রমাণ করবেন যে শান্তিস্থাপনের জন্তে সমরবস্ত্রের সাহায্য নেবার দরকার নেই। তাঁর উপরেই প্রমাণের সবটা দায়, তাঁর

প্রত্যয়

সহযোদ্ধাদের উপরে একটুও না! যতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল ততদিন তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলে তাঁরাও যে তাঁর মতো সমরবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করছিলেন তা তো নয়। তাঁরা তাঁকে ছেড়েছিলেন। কেবল তিনিই তাঁদের ছাড়তে পারছিলেন না ভালোবাসার খাতিরে।

প্রমাণ করতে তিনি একেবারেই পারলেন না, কেমন করে বলি? কলকাতার শান্তি, দিল্লীর শান্তি বহু পরিমাণে তাঁরই চেষ্টার ফল। বেঁচে থাকলে শান্তিরক্ষার কাজ আরো অগ্রসর হ'ত। তবে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ এই দুই কুরুক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। জনশক্তি পিছনে ছিল না। যতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল ততদিন পিছনে ছিল, তারপরে তাঁকে ছেড়েছিল। নয়তো অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আসত না। শেষের দিকে তিনি ছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ, তাঁর সংগ্রাম যেন তাঁর একার সংগ্রাম। যেন জনগণের নয়।

এখন তো তিনি নেই, প্রমাণ করবার দায় তাঁর অবতমানে তাঁর শিষ্যদের। প্রমাণ করা মুখের কথা নয়, করতে হবে জীবন আহুতি দিয়ে। জনগণ যাতে পিছনে দাঁড়ায় তার আয়োজন করতে হবে। নইলে শান্তির কাজ আশাতরুপ অগ্রসর হবে না। নিঃসঙ্গ মানুষের চেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হবে। জনগণ সজাগ না থাকলে তিনি হতো নিহত হবেন।

শান্তিবাদ হচ্ছে শান্তির জন্তে সংগ্রাম। অগ্ন্যাগ্ন সংগ্রামের মতো এখানেও সেনাপতি হবেন একজন, কিন্তু সেনা হবে অগণ্য। জীবন

প্রত্যয়

দান করতে প্রস্তুত হতে হবে প্রত্যেককে এবং তেমন সুযোগ জুটবে অনেকেরই ভাগ্যে। এই পরীক্ষা আরম্ভ করে গেছেন গান্ধীজী, সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। সমাপনের ভার তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের উপরে। তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্য না করেন আর কেউ করবেন আর কোনো দেশে। হয়তো এই যুগেই, নয়তো আর কোনো যুগে। তাঁর আরক্ক কর্ম অসমাপ্ত থাকবে না চিরকাল। সমরবাদ চিরস্থায়ী হবে এ কখনো সত্য নয়। সাম্রাজ্যবাদের মতো সেও একদিন যাবে।

(১২৪৮-৪৯)।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এই দুই চরম পন্থার মাঝখানে হয়তো একটা নবম পন্থা আছে, কিন্তু সেই মধ্যপন্থার নাম গান্ধীপন্থা নয়। গান্ধীপন্থাও এক প্রকার চরম পন্থা। মধ্যপন্থাকে যাবা উত্তম পন্থা বলে বরণ করেছেন তাবা যেন তাকে গান্ধীপন্থা বলে ভুল না করেন। অথবা অপর দশজনকে ভুল না বোঝান।

গান্ধীপন্থাও এক প্রকার চরম পন্থা। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে এর সেই সম্পর্ক যে সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। অর্থাৎ আপোশহীন বিরোধ। এই ভাবটাই ব্যক্তিগত ইচ্ছাচলিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধ্বজার উপর চরকার বজ্রাঙ্কুর এঁকে। 'যাবা বিরোধে বিশ্বাস করেন না, আপোশে বিশ্বাস করেন, তাঁরা তাদের পতাকা থেকে চরকাকে সবিচ্ছেন। চরকাকে সরানো মানে গান্ধীবাদকে সরানো। গান্ধীবাদকে সরানো মানে গান্ধীজীকে সরানো। গান্ধীজীকে সরানোর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গান্ধী হত্যা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হবে যদি তাবা মধ্যপন্থার নাম বাখেন গান্ধীপন্থা।

যেদিন ভারতের গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে খন্ডর তৈরি হবে

প্রত্যয়

সেদিন শহরের কাপড় তৈরি করার জন্তে হয়তো কয়েকটা কাপড়ের কল থাকবে, কিন্তু গ্রামের কাপড়ের জন্তে একটিও কল থাকবে না। আপোশ বলতে এই পর্য্যন্ত। এর বেশি না। মধ্যপন্থীরা কিন্তু প্রত্যেকটি কল চালু রাখতে চাইবেন, স্বযোগ পেলে আরো কয়েকটা বাড়াবেন, তবে তাঁতীর উপর দয়া করে কিছু জায়গা ছেড়ে দেবেন। সূতো জোগাবে কিন্তু চরকা নয়, কল। গ্রাম নয় শহর।

শহরের কাপড়ের কলগুলোতে যে কোটি কোটি টাকার মূলধন খাটছে সেই কোটি কোটি টাকার মূলধন বিপন্ন হবে যদি সাত লক্ষ গ্রামে সাত কোটি চরকা চলে। সূতরাং চরকার সঙ্গে মিলের অহিনকুল সম্পর্ক। চরকাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই মিলওয়ালাদের মূলধন নিষ্ফলক হয়। মিলওয়ালাদের কাছে ধারা শেয়ার কিনেছেন তাঁদেরও ডিভিডেণ্ড নিরাপদ হয়। অতএব চরকাকে তাঁরা জায়গা ছেড়ে দিতে পারেন না। এত দিন যে সহ্য করেছেন সে শুধু গান্ধীজীর হাতে ক্ষমতা ছিল না বলে। ক্ষমতা যেদিন এলো সেদিন চরকাকে সরিয়ে সমঝিয়ে দেওয়া হলো যে ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। তিনি যেমন অক্ষম ছিলেন তেমনি অক্ষম রয়ে গেলেন। না, তার চেয়েও অক্ষম, কেননা দেশ স্বাধীন হবার পরে তো আর অসহযোগ করা চলে না।

চরকা সম্বন্ধে যা বলা গেল ঘানি ঢেঁকি প্রভৃতি গ্রাম্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। এসব যদি গ্রামে গ্রামে চলে তবে শহরের খানকল তেলকল ইত্যাদিতে যে মূলধনটা খাটছে সেটা বিকল হয়। ধারা শেয়ার কিনেছেন তাঁদের ডিভিডেণ্ড মারা যায়। গ্রামগুলো যদি

প্রত্যয়

প্রত্যেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হয় তা হলে কোটি কোটি টাকার মূলধন
বেকার হয়। যারা মূলধনের জন্তে আমেরিকার কাছে দরবার করছেন
তারা তো ইচ্ছা করলে এই স্বদেশী মূলধনটাকে টেনে নিতে পারতেন।
তা হলে গ্রামও বাঁচত, শহরও বাঁচত। এই মর্মে আপোশ করলে
গান্ধীপন্থার সঙ্গে বেথাপ হতো না।

(১৯৪২)

৩০শে জানুয়ারী

বিহু ভাবছিল মনে মনে। এসব কথা কাউকে বলবার নয়, বলে লাভও নেই।

বাপ মায়া গেলে ছেলেরা কাঁদে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাপ যদি পুনঃ হয় তা হলে কি তারা কাঁদে, না জলে পুড়ে মরে? গান্ধীজী যদি দেশশুদ্ধ লোকের বাপু হয়ে থাকতেন তা হলে গান্ধীহত্যার পরে আমরা অণু দৃশ্য দেখতুম! দেখতুম দেশের লোকের চোখে জল নেই, চোখ দিয়ে আগুন বেলোচ্ছে। সে আগুন অহিংস হতে পারে, তবু তা আগুন। তা ল নয়।

কিন্তু দেখা গেল তাদের চোখে আগুন নেই। অধিকাংশের চোখে জল। অনেকের চোখে কুটিল হাসি। তাদের কেউ কেউ মিষ্টার বিতরণ করেছে, কেউ কেউ মিষ্টিমুখ করেছে। আগুরুংজের অবতার হিন্দুর সর্কনাশ করতে জন্মেছিলেন, বেঁচে থাকেনে সর্কনাশ করতেন। শিবাজীর অবতার তাই তাঁকে বিনাশ করেছে। কে কার উপর রাগ করবে!

গান্ধীহত্যার পর দু'বছর কেটে গেছে। এই দু'বছরে অস্তুতঃ এইটুকু উন্নতি হয়েছে যে গান্ধীজী যে হিন্দুর শত্রু একথা লোকে সহজে বিশ্বাস করে না। বছর দু'তিন বাদে একেবারেই বিশ্বাস করবে না। তখন আসবে রাগ করার সময়।

প্রত্যয়

সে রাগ জোয়ারের মতো আসবে। হয়তো হিংসার আকার নেবে। অহিংসার রূপ নিলেও সে রাগ জোয়ারের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই শক্তিকে যে শক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ পথে।

বিপ্লবকে বেশী দিন বিভ্রান্ত করা যায় না। এক বছর, দু'বছর, তিন বছর, চার বছর, পাঁচ বছর। না, তার বেশী নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর বিচ্ছেদ, নেতার সঙ্গে তাঁর অনুবর্তীদের বিচ্ছেদ কখনো এত কাল স্থায়ী হতে পারে না। তা যদি হয় তা হলে বুঝতে হবে দেশ ও কাল গান্ধীজীর জন্মে প্রস্তুত ছিল না, তিনি এ দেশের ও এ যুগের মানুষ ছিলেন না। আমি কিন্তু অবুঝ। আমি কিছুতেই মানব না যে গান্ধীজী এ যুগের বা এ দেশের নন। এ যুগের সঙ্গে, এ দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আকস্মিক নয়। এ যোগাযোগ এত গভীর যে ভারতবর্ষ একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে আবিষ্কার করবে তাকে গান্ধীনেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলেই সে অন্ধকারে পথ খুঁজে মরছে।

জনগণের সেই ক্রোধ কেউ রোধ করতে পারবে না। তবে ইচ্ছা করলে তাকে অহিংস প্রণালীতে পরিচালিত করা যায়। তা হলেই তা ধ্বংসের জন্মে উদ্ভাদ না হয়ে সৃষ্টির জন্মে উঠোঁগী হবে। তখন সেই সৃষ্টিও হবে বৈপ্লবিক। জালা না থাকলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি করতে পারে সেই ব্যক্তি বা সেই দেশ যে জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলছে।

(১৯৫০)

বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা

আশাবাদী হয়তো আরো কিছুক্ষণ বসতেন, কিন্তু নিরাশাবাদীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় যেন কী কাজ আছে। তিনি যাবার সময় বললেন, “ভুলে যাবেন না, এটা হচ্ছে যাকে বলে ট্রানজিশন পিরিয়ড। ও রকম একটু আধটু হবেই। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এবং তার সূচনা,” তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, “আর পাঁচ বছরের মধ্যে পরিস্ফুট হবে। এদেশের উপর ভগবানের বিশেষ করুণা আছে।”

নিরাশাবাদী এর উত্তর দেবার জগ্রে মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, আশাবাদী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, “আমি ইন্টেলেক্ট দিয়ে এই প্রত্যয়ে পৌছই নি। আমার কিছু অকান্ট পাওয়ার আছে। আমি দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। ভারত যে স্বাধীন হবে এও আমি দেখতে পেয়েছিলুম ঘটনার ঠিক পাঁচ বছর আগে। সেই ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে।”

তাকে পরে রাখা গেল না। নিরাশাবাদী তর্কের স্বেযোগ হারিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, “বেশ আছেন ভদ্রলোক।” তারপর বললেন, “কেন এমন হলো! একটা স্বাধীন দেশ, এই তার স্বাধীনতার চেহারা। এরই জগ্রে তপস্বী করেছিলুম কৈশোরকাল থেকে। কোথাও এতটুকু

প্রত্যয়

উৎসাহ নেই, প্রেরণা নেই। হিমালয়ের মতো অবিচল কঠোর—
কবেদে ঈরা মরেদে—সংকল্প নেই। আছে কেবল অকর্মক চিন্তা,
অকান্ট পাওয়ায়! ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!”

বিহ্ব চূপচাপ বসেছিল। বহুদিন ধরে ভাবছে, কিন্তু ভেবে কোনো
কুল কিনারা পাচ্ছে না। যেখানে বিশ্বাসের জোর নেই সেখানে চিন্তা
একপ্রকার চিত্তবিনোদন। বলল, “পরিবর্তন হবেই।”

নিরাশাবাদী বিশ্বাস করলেন না। বললেন, “পরিবর্তন তো মন্দের
দিকে হতে পারে।”

বিহ্ব বলল, “তবে শোন। আজকে আমার পালা বলবার, তোমার
পালা শোনবার। কাল পালাবদল হবে।

আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, যে বিশ্বাস
আমাদের ছিল। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে বিধাতা এক একটা
দেশ সৃষ্টি করেছেন এক একটা পরীক্ষার জগ্রে। ইংলণ্ডে তাঁর যে
পরীক্ষা চলেছে তাঁর নাম ডেমক্রেসী। আগে ছিল পলিটিকাল
ডেমক্রেসী। এখন সোশ্যাল ডেমক্রেসী। রাশিয়ায় তাঁর পরীক্ষা
কমিউনিজম। কমিউনিজমের বোজ সে দেশের মাটিতে ছিল কিন্তু সেটা
ছিল ইউটোপিয়ান। এখন হয়েছে ন্যায়েটিফিক। তেমনি ভারতবর্ষেও
তাঁর পরীক্ষা চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। তাঁর এই পরীক্ষার নাম
অহিংসা। আগে ছিল ব্যষ্টিগত। এখন সমষ্টিগত। আমাদের জীবনে
আমরা এর যেটুকু দেখেছি হয়তো তার বেশী দেখতে পাব না। হয়তো
এর পরে যা আসছে তা এর বিপরীত। কিন্তু আমাদের জীবন দিয়ে জাতির

প্রত্যয়

জীবনের ইয়ত্তা হয় না। জাতির জীবনে অহিংসার পরীক্ষা বারম্বার হবে, হয়তো কোনবারই নিখুঁত হবে না, তবু হবে, হবে, হবে। মহাত্মার মতো এত বড় নেতা আর আসবেন না, কিন্তু বিধাতার কাজ মহাপুরুষের জগৎ অপেক্ষা করে না, সামান্য মানুষকে দিয়েও তিনি তাঁর কাজ করিয়ে নেন।

সমষ্টিগত অহিংসার জগ্রে ভারতের মুখ চেয়ে আছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ। তাদের সেই প্রত্যাশা আমরা পূরণ করতে পারছি নে। মহাত্মাকেও শেষে স্বীকার করতে হলো যে আমাদের এই অহিংসা সত্যিকার অহিংসা নয়, নিক্রিয় প্রতিরোধ। সত্যিকার অহিংসা প্রেমিকের ধর্ম, বীরের ধর্ম। আমরা তার পরীক্ষা দিইনি। আমাদের হয়ে তাঁকেই তার পরীক্ষা দিতে হলো। অগ্নিপরীক্ষা। সমষ্টির জীবনে এ শিক্ষা : ব্যর্থ হবে না। আমাদের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী নয়। হলে দেখতে পেতুম এ শিক্ষা জাতির অন্তরে প্রবেশ করেছে, অন্তরালে কাজ করেছে। সময় না হলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। কবে সময় হবে তা কেউ বলতে পারে না। পঞ্চাশ বছরও তার পক্ষে বেশী সময় নয়। মহাত্মা তো আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচতেই চেয়েছিলেন তার দেবী আছে আনন্দাজ করে। হয়তো অত দেবী হবে ন', তাঁর দীর্ঘ জীবনের চেয়ে তাঁর হত্যাই তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হবে। তিনি বেঁচে থাকলে যার জগ্রে পঞ্চাশ বছর লাগত তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন বলেই তা দশ বছরে হবে।

আমার নিজের বিশ্বাস গান্ধীজীর পরীক্ষার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক আকস্মিক নয়। যেমন লেনিনের পরীক্ষার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক

প্রত্যয়

আকস্মিক নয়। আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের ষোলো আনার নাড়ীনক্ষত্র জানিনে। যেমন রাশিয়ার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী জানত না। তাদের মতো আমাদেরও অহঙ্কার আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার মালিক। এ অহঙ্কার অজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়েছে। একটা ভূমিকম্পেই এর পতন ঘটবে। গান্ধীজী এ দেশকে সমস্ত সত্তা দিয়ে চিনেছিলেন, তাই অত বড় একটা পরীক্ষায় নামতে সাহস পেয়েছিলেন। দেশের ষোলো আনার উপর তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি কোনো দিন হতাশ হননি। আমরা তো একটুতেই হতাশ হই। আমাদের আশাবাদীর অকান্ট পাওয়ার তাঁকে হতাশার হাত থেকে বাঁচাবে না, যখন দেখবেন মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সঙ্কটের দিন ছত্রভঙ্গ হয়েছে। আসলে আমাদের আশাবাদও এক প্রকার নিরাশাবাদ, কারণ এর পিছনে কোনো সত্যিকার শক্তি নেই, যা আছে তা ঐ অকান্ট পাওয়ার। বিপদের দিন ও শক্তি আমাদের পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ষোড়দৌড় করিয়েছে, এর পর করাবে হিমালয়ে ঠেঁ দৌড়।

শক্তি আসে জর্নগণের সঙ্গে অভিন্ন হলে। শক্তি আসে বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হলে। এর কোনোটাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমাদের বিশ্বাস পুলিশে, আমাদের বিশ্বাস ফৌজের। অবস্থা আর একটু খারাপের দিকে গেলেই আমরা মিলিটারির হাতে শহর তুলে দেব। মিলিটারি যদি অক্ষম হয় তা হলে আমাদের দশা হবে চীনা মধ্যবিত্তদের মতো। ওরা এখন সন্ধির জগ্গে আকুল। এই আকুলতা পাঁচ বছর আগে ছিল না। তখন অকান্ট পাওয়ার ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

প্রত্যয়

স্বপ্নে বিভোর করেছিল। তার পিছনে ছিল মিলিটারি পাওয়ার সম্বন্ধে
পরম নির্ভরতা।

গান্ধীজী জানতেন যে, সঙ্কটের দিন পুলিশ বা মিলিটারির উপর
একান্ত নির্ভর করা যায় না। নির্ভর করভে হয় ভগবানের উপর তথা
জনগণের উপর। ভগবানের বিশেষ করুণার উপর নয়, তাঁর ঐতিহাসিক
ইচ্ছার উপর। সে ইচ্ছা রাশিয়াতে, ইংলণ্ডে, চীনে, ইন্দোনেশিয়ায়,
আফ্রিকায় কাজ করেছে, কেবল ভারতবর্ষে নয়। বিশেষ করুণা তাঁর
কারো উপর নেই; তবে বিশেষ দেশে তাঁর বিশেষ পরীক্ষা। আমাদের
এখানে কিসের পরীক্ষা হচ্ছে তা যদি জানি ও তার সহায়তা করি তবেই
তাঁর করুণা পাব।”

বাস্তববাদী

বাস্তববাদী বললেন, “দেশ যখন পরাধীন ছিল, নিজেদের যখন সৈন্তদল ছিল না, যখন হিংসার নাম করলে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত তখনকার দিনে অহিংসার হয়তো কোনো প্রয়োজন ছিল। এদং চরকার। যদিও অহিংসার সঙ্গে চরকার যে কী সম্পর্ক তা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, নিজেদের একটা সৈন্তদল রয়েছে, কলকারখানা বিদেশীর হাত থেকে দেশের লোকের হাতে আসছে। এখন অহিংসার কী প্রয়োজন, চরকার কী দরকার, বলতে পারো?”

বিশ্ব বলল, “আমরা জানতুম যে দেশ স্বাধীন হলে এ প্রশ্ন একদিন উঠবে। সেইজন্তে আজ দেশের মতিগতি দেখে অবাক হচ্ছি। হচ্ছি তাঁদের মতিগতি দেখে যাঁরা ত্রিশ বছর ধরে গান্ধীজীর কাছে মূলনীতির পাঠ নিয়েছিলেন। না, অহিংসার কোনো প্রয়োজন নেই, চরকার কোনো দরকার নেই, গান্ধীজীও গেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনাও গেছে। তোমরা যত শীগগির পারো তাঁকে ভুলে যাও, ভুলে যাও যে তাঁর সহকর্মী হিসাবে তোমাদের উপর তাঁর সাধনার দায় বর্তেছে। শুধু দয়া করে একটি কাজ করো। জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে বলো যে গান্ধীজীকে তোমরা ছেড়েছ।”

প্রত্যয়

“জনগণ,” বাস্তববাদী বললেন, “এখনো গান্ধীজীর নামে ভোট দেয়। আমরা যদি বলি যে আমরা গান্ধীজীকে ছেড়েছি তা হলে তারা আমাদের ছাড়বে। কাজেই আমরা অমন কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনে। তা বলে যা কার্যক্ষেত্রে অচল তা চালাতে গিয়ে নাকাল হই কেন? তুমি কি মনে করেছ কলকারখানা উঠিয়ে দিতে চাইলেই উঠে যাবে? কলকারখানা উঠিয়ে দিলে সৈন্যদলকে অস্ত্র জোগাবে বস্ত্র জোগাবে কী করে? আর সৈন্যদল ভেঙে দিলে পাকিস্তানকে ঠেকাবে রাশিয়াকে ঠেকাবে কী দিয়ে? আমাদের উপর এখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমরা কি এসব এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পারি?”

“তা কি আর বুঝিনে?” বিহু বলল, “গান্ধীজীর পরীক্ষা তোমরা যে চালাবে না তিনি সে কথা বুঝতেন। তার জন্তে তাঁর মনে দুঃখ ছিল। কিন্তু পরীক্ষার দরকার থাকলে চালাবার লোকেরও দরকার থাকে। ভগবান তাঁদের জোটাবেন। তেমন লোক যে আজ নেই তা নয়। তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন পরীক্ষা। যে কোনো একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখবে যে ত্রিশ বছরে এ পরীক্ষা অনেকদূর এগিয়েছে, আরো এগোবে সামনের দশ বছরে। তোমাদের জন্তে এ পরীক্ষা বসে থাকবে না। তোমরা যখন থাকবে না তখনো এ পরীক্ষা চলতে থাকবে। জনগণের আধ্যাত্মিক তথা আধিভৌতিক প্রয়োজন মিটছে এ দিয়ে। যদিও তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না কেন এর দরকার। কার্যকালে তারাও অহিংসা মানে না, চরকা মানে না, কিন্তু তারা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে এসব তাদেরই জন্তে। তোমাদের মতো

প্রত্যয়

তাদের মনে অবিশ্বাস নেই। সেইজন্তে তারা গান্ধীজীকে ছাড়েনি। ছাড়বেও না কোনোদিন, যদি তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যাবার মতো দশ বিশজন অহুচর থাকেন।”

বাস্তববাদী বললেন, “গান্ধীজীকে তারা ভালোবাসে, কিন্তু গান্ধীবাদ হলো অগ্নি জ্বিনিস। গান্ধীবাদের উপর তাদের বিশ্বাস ক’দিন থাকবে? ইতিমধ্যেই তাদের বিশ্বাস টলেছে। তারা চায় পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ। তারা চায় ভারতকে নির্মূলমান করতে। তার প্রমাণ তারা নিজের হাতে দিচ্ছে। গুলি চালিয়ে তাদের নিরস্ত করছি আমরা, নইলে তাদের নিরস্ত করা শিবের অসাধ্য। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এবার অনশনে মরতেন। এবার তিনি বাঁচতেন না।”

“কী জানি, আমি অতটা নিশ্চিত নই। উত্তেজনার মুখে মানুষ অনেক কিছু চায়। নিজের হাতে স্ত্রী-পুত্রকে বিষ খাইয়ে মারে, নিজেও মরে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া, ভারতকে নির্মূলমান করতে যাওয়া সেই জাতীয় ব্যাপার। পাগলামি একদিন সারবে। সেদিন অহুতাপ করবে।”

“তুমি তো বাস্তববাদী নও। যদি দেখতে তাদের চেহারা তা হলে নিশ্চিত হতে। তোমার পাকিস্তানের জনগণ তো জানোয়ার। আর এখানকার নেড়েরা—”

“যাক, তা হলে আসছে বারের ভোটের সময় গান্ধীজীর নাম মুখে আনবে না তোমরা। কেমন, ঠিক তো?” বিহু তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

প্রত্যয়

“ভোটের সময়,” তিনি বললেন, “ওদের অশ্রু রকম চেহারা। যে হাত দিয়ে মানুষ খুন করেছে, ঘরে আগুন লাগিয়েছে, সেই হাতেই গান্ধীবাবার বাস্তব ভোট দেবে ওরা। আমরা বাস্তববাদী কিনা, তাই কার কোথায় দুর্বলতা ঠিক ধরতে পারি।”

“তোমরা যেমন তাদের এক ধরনের দুর্বলতার স্বযোগ নিচ্ছে তেমনি তাদের আরেক ধরনের দুর্বলতার স্বযোগ নিচ্ছে অশ্রু লোক। নইলে তারা এমন বর্বর হতো না। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সে রাজ্য টেকে না। দেখলে না ইংরেজের দশা? দেখে শিখলে না? বাস্তববাদী হিসেবে ওদেরও স্তব্ধ ছিল, কিন্তু অপরের দুর্বলতার স্বযোগ নিলে প্রবল প্রতাপেরও পতন হয়।”

“তা বলে,” বাস্তববাদী অস্বযোগ করলেন, “কেমন করে আমরা গান্ধীজীর পরীক্ষা চালাতে যাই? রাষ্ট্রের দায়িত্ব যাদের কাঁধে কেমন করে তারা অহিংসা নীতি প্রয়োগ করবে? কেমন করেই বা তারা মিলের বদলে চরকা, রেলের বদলে গোরুর গাড়ী ব্যবস্থা করবে? করতে গেলে দেখবে লোকে নারাজ। ধনিকদের দিক থেকে বাধা আসবে, তা হ্যাঁ বুঝতেই পারো। বাধা আসবে শ্রমিকদের দিক থেকেও। তারা গ্রামে ফিরে গিয়েও অত মজুরি পাবে না। এমন স্বাচ্ছন্দ্য পাবে না। কেবল যে উৎপাদকরাই বাধা দেবে তা নয়, বাধা দেবে উপভোক্তারাও। মিলের কাপড় যেমন সস্তা যেমন হালকা, যেমন সহজে কাটা যায়, যেমন ছেঁড়ে কম, চরকার স্বতোর খদ্দর তেমন নয়। তুমি যদি আইন করে গ্রামের লোকের উপর খদ্দর চাপিয়ে দিতে যাও তা হলে দেখবে খদ্দরের

প্রত্যয়

খাণ্ডবদাহন হবে। আমরা বলি আগে জনমত গঠন করো, তার পরে ধীরে ধীরে—”

“ধানকল তেলকল চিনির কারখানা সম্বন্ধেও তুমি সেই কথা বলবে। তার মানে সবুর করতে হবে অনন্তকাল। হাতে গবর্ণমেন্ট এগেও কোনো পরিবর্তন ঘটল না। এর কারণ কী, বলব? ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। তোমাদের যে ইচ্ছাই নেই। তোমরা বোঝা লোকের দুর্বলতা। লেনিন যদি তাই বুঝতেন তা হলে ইতিহাসে এত বড় একটা পরিবর্তন আনতে সাহস পেতেন না। গান্ধী যদি তাই বুঝতেন তা হলে সশস্ত্র সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্তে নিরস্ত্র জনতাকে আহ্বান করতেন না। জনগণ দুর্বলও বটে, সবলও বটে। তাদের সবলতার কাছে আবেদন করলে দেখবে তারা সব রকম ত্যাগ স্বীকারে রাজি। মিলের কাপড় ত্যাগ করতে পারবে না? কারখানার রোজগার ত্যাগ করতে পারবে না? পারবে সবই, যদি বিশ্বাস করে যে এসব তাদের দেশের জন্তে ত্যাগ। কিন্তু আজ যারা তাদের কাছে আবেদন করছে তারা করছে ধর্মের নামে, দলের নামে। স্বাধীনতার পরে দেশকে তো তারা ভুলে যেতে বসেছে।” বিহু আক্ষেপ করল।

বাস্তববাদী বললেন, “হ্যাঁ, তোমার কথা হয়তো সত্য। কিন্তু এসব করতে গেলে কলঙ্কালাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী রকম দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছ?”

“চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে তাঁর স্বত্ত্বগোষ্ঠীর মতো নয়!” বিহু

বলল।



প্রত্যয়

“তুমি কি মনে করো শম্ভবগোষ্ঠীর সঙ্গে ঝগড়া করলে চিয়াং টিকে থাকতে পারতেন?”

“পারতেন না হয়তো, কিন্তু এখন যে স্বাক্ষরে পলায়ন।”

“না, না, হাসির কথা নয়। ধনীর সঙ্গে ঝগড়া করা গান্ধীজীও পছন্দ করতেন না।”

বিহু বলল, “বিনা কারণে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোক বাস করে গ্রামে। অথচ সেখানে তাদের জীবিকা বলতে আছে একমাত্র কৃষি। তাও বছরে ছ’মাস। কৃষির সঙ্গে শিল্প যতদিন ছিল ততদিন তারা স্বাবলম্বী ছিল। এখন তারা বাইরে থেকে শিল্পজাত দ্রব্য নেয়, তার বিনিময়ে দেয় কৃষিজাত দ্রব্য। ফলে তাদের খোরাক কম পড়ে। উন্নততর কৃষি দিয়ে এর সমাধান আংশিকভাবে হবে। কিন্তু পূর্ণ সমাধান হবে গ্রামে গ্রামে শিল্প প্রবর্তন করলে। তা হলে গ্রামের অন্ন গ্রামে থাকবে। গ্রামের লোক খেয়ে বাঁচবে।

“আর আমরা?” বাস্তববাদী আঁতকে উঠলেন। “আমরা না খেয়ে মরব?”

“আমরা,” বিহু হেসে বললে, “তখন হোটেলে না গিয়ে গ্রামে যাব খেতে। মাল্লুষ যেখানে খেতে পায় সেখানে ঘর বাঁধে। শহরে খেতে পাচ্ছে বলে শহরে বাসা করেছে, খেতে না পেলে শহর খালি করে গ্রামে গিয়ে জুটবে। তবে তোমার ভয় নেই। গ্রামে যে সব না তৈরি হবার নয়, অথচ চাইই চাই, সে সব জিনিষের বিনিময়ে গ্রামের

প্রত্যয়

লোক তাদের বাড়তি খাদ্য শহরের জন্তে ছাড়বে। শহরের লোকসংখ্যা কমবে, কিন্তু শহর একেবারে উজাড় হবে না। কলকাতায় লাখ দশেক লোক যথেষ্ট।”

বাস্তববাদী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসলেন। তারপরে বললেন, “তা হলে তুমি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে চাও। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন উল্টে দিয়ে দেশকে ফিরে যেতে বল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এটা কি সম্ভব না সম্ভব?”

“সম্ভব ও সম্ভবত। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাওয়া মানে পিছনে ফিরে যাওয়া নয়। এটাও অগ্রগতি। আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন একদিনের জন্তে বন্ধ থাকবে না। এতদিন সে শহরের সেবায় লেগেছে, এখন থেকে লাগবে গ্রামের সেবায়। তার ফলে যা ঘটবে সেটাও এক প্রকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন। চরকা বলতে আমি শুধু চরকা বুঝিনে, বুঝি গ্রামের লোকের নিত্য ব্যবহার্য যে কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—বিদ্যুতের দ্বারা, বাষ্পের দ্বারা চালিত হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু একই লোক হবে একাধারে মালিক ও শ্রমিক। যে ক্ষেত্রে ষোল আনা মালিক হওয়া সম্ভব নয় সেখানে অংশীদার হবে, তথা শ্রমিক হবে। শ্রম ও ধন দুই স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হবে না। তা যদি হয় তবে গ্রামে ফিরে যাওয়া ব্যর্থ হবে।”

“আমি কেবল ভাবছি এর চেয়ে কমিউনিজম ভালো। ওরা তো আমাদের শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করবে না। কলকাতা ছেড়ে আরাম-

প্রত্যয়

বাগ যেতে হবে শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। সেখানে গিয়ে বাস করতে হবে! তা হলেই হয়েছে।”

“কিন্তু ভোটের সময়?”

“ভোটের সময়?” বাস্তববাদী চাঞ্চা হয়ে উঠলেন, “ভোটের সময় আমি যে কোনো ছুলায় যেতে রাজি। হাইকমাণ্ড যদি টিকিট দেয় তা হলে আমি আলিপুর ডুয়াস থেকে দাঁড়াব। যমে মাহুবে টানাটানি করলেও আমি বেঁচে ফিরে আসব কলকাতায়। তারপরে আবার পাঁচ বছর পরে আমার ভোটারদের সঙ্গে দেখা।”

(১৯৫০)

— — —

আমরা তা হলে কী করব

১৯১৭ সালে ছুনিয়ার যেখানে যত ধনপতি ছিলেন সকলের বুকের রক্ত মুখে উঠল। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন আকাশে এক ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। প্রথম প্রথম তাঁদের ধারণা ছিল ইতিহাসের গগনে অমন কত উদয় হয়েছে, উদয়ের পর অন্ত গেছে। এবার কিন্তু অস্ত্র বাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তখন তাঁরা শঙ্কিত হলেন। এ কি তা হলে সেই ধূমকেতু জয়দেব কবির কল্পনায় যে ছিল কঙ্কি অবতারের প্রতিক্রম?

শ্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং

ধূমকেতুমিব কিমপি কল্পালং

কেশব ধৃতকঙ্কিশরীর। জয় জগদীশ হরে।

শঙ্কা সবচেয়ে বেশী জার্মান ধনপতিদের। কারণ ১৯১৮ সালে তাঁদেরও ঘরোয়া আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল, স্থিতি হয়নি। আবার যদি আসে! পাশের বাড়ীর আকাশে যিনি জলছিলেন তিনি যখন পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তাঁরা প্রমাদ গণলেন। এই সময় এক রণপতির আবির্ভাব ঘটে। ইনি দশ বারো বছর ধরে এই লয়টির জন্তে পয়তারা কষছিলেন। স্বদেশের গণপতিদের ঠেঙিয়ে-ঠ্যাং ভেঙে দেবার পর এঁর এমন বাড় বাড়ল যে ধনপতিরা

প্রত্যয়

সহজেই বিশ্বাস করলেন এঁর মতো লাঠিয়াল থাকতে ধূমকেতুর ভয় নেই।

কিন্তু জার্মানীকে শক্তিসংকল্প করতে দেখে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বাস হলো না যে মুদগরটি শুধু স্বদেশের গণপতিদের উরুভঙ্গের পর শাস্ত হবে। রাশিয়ারও বিশ্বাস হলো না যে জার্মানীর রণবল সন্ধিনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে। আরেক দফা বলপরীক্ষার জন্তে ইউরোপের মহা-শক্তির প্রস্তুত হতে লাগলেন। তারপর যা ঘটল তা ধাপে ধাপে যুদ্ধের দিকে এগোনো। শেষে যুদ্ধ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রমিকরা যেভাবে আহ্বাননিদ্রা ত্যাগ করে কাজে লেগে গেল তা লক্ষ্য করে সেসব দেশের ধনপতিদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ধরো, যুদ্ধের পরে যদি এই লক্ষ্মী ছেলেগুলিকে অধিকতর অববস্ত্র দেওয়া হয় তা হলে কি এরা অধিকতর পরিশ্রম করে অধিকতর উৎপাদন করবে না? তা যদি করে তবে আর ভাবনা কিসের? সমস্তার সমাধান তো হয়েই রয়েছে। ইংলণ্ড আমেরিকার ধনপতিদের সঙ্গে সেসব দেশের গণপতিদের যেমন গলায় গলায় ভাব তা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে মার্কস্ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী সেসব দেশেও সত্য হবে। কিন্তু যদি জার্মানীতে হয়! না, তা হতে দেওয়া হবে না। জার্মানী দখল করতে হবে। ততকাল ধরে দখল যত কাল সঙ্কটের আশঙ্কা। জার্মানী যদি রাশিয়ার পথ ধরে তবে ফ্রান্স কি ধরবে না? ফ্রান্স যদি সে পথের পথিক হয় তবে ইংলণ্ড কি বিপথগামী হবে না? আর ইংলণ্ড যদি গোলায় যায় আমেরিকা কি সন্দোষ এড়াতে পারবে?

প্রভায়

সেইজন্তে জার্মানী দখল করার জন্তে যেন আমেরিকারই গরজ সব চেয়ে বেশী। অবশ্য এর সঙ্গে জুটেছে প্রতিযোগী যন্ত্রশিল্পকে করতলগত করার অভিসন্ধি। এবং রাশিয়ার সঙ্গে ব্যালান্স অফ পাওয়ার। আস্ত জার্মানীটাই যদি রাশিয়ার দিকে ঝোঁকে তা হলে বাটখারার ভারসাম্য থাকে না। সমস্তটা দখল করতে পারলেই চমৎকার হতো, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

ওদিকে যেভাবে উৎপন্ন সামগ্রী অগ্নিসাৎ হচ্ছে অধিকতর উপাদান সম্বন্ধেও উৎপাদক শ্রেণীর উদর ও পৃষ্ঠ অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে আসছে। যুদ্ধটা এইবেলা মধুরেণ সমাপয়েৎ হলেই বাঁচি। যদি আরো দু'বছর গড়ায় তা হলে ঐ যে মধুর সমাধানটি ওটি তেমন মুখরোচক হবে না। শ্রমিক যখন বখরা চাইবে খনিক বলবেন, “তুমি তো বড় লক্ষ্মী ছেলে নও হে।” তখন ক্যাপিটালিজম ছদ্মবেশী ফাসিজম হয়ে উঠবে। ঠিক এই অভিজ্ঞতাটি ভারতবর্ষেরও হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা কিন্তু উভয়সঙ্কটে পড়ব।

সঙ্কটের দিন আমরা যারা মধ্যবিত্ত আমরা কি কোনো একটা পক্ষ নেব? না আমরা বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী হব? এ ছাড়া আরো দুটো বিকল্প আছে। এক, দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখা। দুই, দু'হাত দিয়ে দু'পক্ষকে ধরে ছাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। দু'পক্ষের চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর। পাঠক, তুমি হয়তো সরে দাঁড়াবে, আমি কিন্তু সেটি পারব না। আমি ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হয় দু'হাত দিয়ে ওদের ছাড়াছাড়ি ঘটাব, নয় দু'পক্ষের

প্রভাষ

চাপে গুঁড়ো হয়ে যাব। আমি মধ্যবিত্ত না, মধ্যস্থ হ'ব বলে স্থির করে রেখেছি। যদি দরকার হয়। মধ্যবিত্তরা দু'পক্ষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। আর মধ্যস্থরা খায় দু'দিক থেকে মার। মধ্যস্থ যারা হবে তারা ত্রায়পরায়ণ হবে। তারা পদে পদে ত্রায় অত্রায় বিচার করবে, যার অত্রায় তাকে সেকথা বোঝাবে, যার দিকে ত্রায় তাকে নৈতিক সমর্থন জানাবে, এবং এর দরুণ উভয় পক্ষের লাখিটা কিলটা বখশিশ পাবে। তাদের কপালে আর কোনো পুরস্কার নেই।

২

উপরের অংশটি যুদ্ধের সময় লেখা। বোধহয় ১৯৪৪ সালের শেষে কিংবা ১৯৪৫ সালের প্রারম্ভে। তারপর আমার অলক্ষে আমার এক-খানা পুরোনো খাতার পাতায় লুকিয়েছিল। এই সেদিন নজরে পড়ল। অল্পস্বল্প পরিবর্তন করে প্রকাশ করাছি।

এখন এই পাঁচ এড়রের হিসাব নিকাশ করা বাক।

আমেরিকা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। জার্মানীর আধাআধি দখল করে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইংলণ্ড যা চেয়েছিল তা পায়নি। বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। তার নিজের ঘরেই ছোটখাট একটা বিপ্লব খটে গেছে। তার সাম্রাজ্যের একাংশ স্বাধীন হয়েছে। সেও একরকম বিপ্লব। তা হলেও ইংলণ্ড এখনো তার সনাতন ব্যালান্স অফ পাওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসবান। জার্মানীকে সে উঠতে দেবে না।

প্রত্যয়

জার্মানদের শক্তিবৃদ্ধি দেখলেই সে ভয় পাবে। তারা নাৎসী হলেও যে ভয় তারা কমিউনিস্ট হলেও সেই ভয়। এমন কি তারা অখণ্ড হলেও সেই ভয়। জার্মান জাতিটাই একটা আতঙ্ক, কেবল ইংলণ্ডের চোখে নয়, ফ্রান্সের চোখেও! অখচ জার্মানীকে চিরকাল পার্টিশন করে রাখা যাবে না। ইংরেজ করাসী কি তা বোঝে না? বোঝে ঠিকই। কিন্তু ভয় যে যায় না।

জার্মানীর বল ধীরে ধীরে ফিরছে। আর কয়েক বছর পরে সে যদি ইচ্ছা করে তবে নিজের চেষ্টায় অখণ্ড হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা কি তার আছে? ইচ্ছা যেমন বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নেই তেমনি জার্মান নাৎসী কমিউনিস্টের নেই। একদা যেমন প্রোটেস্ট্যান্টে ক্যাথলিকে মিলে জার্মানীকে খণ্ড খণ্ড করেছিল এখনো তেমনি নাৎসীতে কমিউনিস্টে মিলে করতে পারে। জার্মানীর নিজস্ব অন্তর্বিরোধ তার অখণ্ড হবার ইচ্ছা কেড়ে নিয়েছে। তার অন্তর্বিরোধের নিষ্পত্তি সেবারে তো হয়নি, এবারে কি হবে! যতদূর দৃষ্টি যায় জার্মানীকে বিভক্ত হয়েই থাকতে হবে, তবে পরাধীন হয়ে নয়। তার পরাধীনতার শিকল খসে পড়বে।

ওদিকে বৃহত্তর পটভূমিকায় শক্তিপরীক্ষার যে আয়োজন চলছে তা লক্ষ করে কেউ স্থির থাকতে পারছে না। প্রত্যেককেই চিন্তা করতে হচ্ছে, আমি কোন পক্ষে যাব। চীনারা ইতিমধ্যেই এর একটা উত্তর দিয়েছে। ওরা কমিউনিস্ট হয়েছে, ক্রশ পক্ষে যাবে। ভারতীয়রা মুখে বলছে, আমরা কোনো পক্ষে যাব না। আমরা কমিউনিস্টও না। কথাটা সত্য। স্বতরাং অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। কিন্তু এখনো

প্রত্যয়

আমাদের টিকি ইংরেজদের পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের সঙ্গে বাঁধা। আর্থিক বিপর্যয়ের ভয়ে আমরা কোনদিন কী করে বসব তা আমরাই চব্বিশ ঘণ্টা আগে জানতে পাব না। এটা যে সত্য তা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? ডিভ্যালুয়েশনের নাটকীয়তা এখনো বাসি হয়নি।

আর্থিক বিপর্যয় এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তবে মুখের কথা বাই হোক না কেন যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হব। অপর পক্ষে, যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তা হলে আর্থিক বিপর্যয়ের জন্তে এখন থেকে মনটাকে তৈরি করতে হবে। তার মানে পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের সঙ্গে টাকার সাত পাকের সম্পর্ক এক দিন না এক দিন কাটাতে হবে ও তার ফলভোগ করতে হবে। পাকিস্তান পাউণ্ডের মায়া কাটিয়েছে, কিন্তু ডলারের মায়া কাটায়নি। ডলারের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমনি রয়েছে। তার দাড়ি ডলারের সঙ্গে বাঁধা। তাকেও মনঃস্থির করতে হবে, কোনটা শ্রেয়ঃ। যুদ্ধে যোগদান, না আর্থিক বিপর্যয়।

ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সম্মুখে এই একই প্রশ্ন! এত বড় প্রশ্ন আর নেই। কে কী ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তার উপর নির্ভর করছে সমস্ত ভবিষ্যৎ। উত্তর দেওয়া যে কত কঠিন তা আমি জানি ও বুঝি। কিন্তু তা বলে নিরুত্তর তো থাকা যায় না। এক দিন না এক দিন উত্তর আমাদের দিতেই হবে। উত্তর যদি হয় যুদ্ধে যোগদান তা হলে আর্থিক বিপর্যয় হয়তো ঘটবে না। কিন্তু বাধ্যবে অন্তর্বিরোধ। ভারতের আত্মা যুদ্ধ চায় না। ভারত শান্তিকামী। ভারতের জনগণ

প্রত্যয়

একটা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেছে গান্ধীনেতৃত্বে। আরেকটা যুদ্ধের প্রতিকূলতা করবেই, কার নেতৃত্বে জানিনে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধে যোগদান না করলে আর্থিক বিপর্যয়ের জগ্রে দেশশুদ্ধ লোককে সময় থাকতে প্রস্তুত করতে হবে। অতি দুরূহ কাজ। খাণ্ড আমদানি বন্ধ হতে যাচ্ছে, এক এক করে অনেক কিছুর আমদানি বন্ধ হবে। আমদানি বন্ধ হলে রপ্তানি বন্ধ হতে বাধ্য। দেশের কাঁচামাল দেশের কলকারখানায় ব্যবহার করতে হবে। কলকারখানারও বিদ্যেদ্রষ্টী-করণ প্রয়োজন হবে। তাতে বণ্টনের সুবিধা।

সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ ও প্রচলন কমাতে হবে। বিনিময় চলবে যথাসম্ভব বাটার প্রথায়। এবং চরকার সূতোর মাধ্যমে। বাড়ীতে বাড়ীতে শিল্প ও কৃষি চর্চা ব্যাপক হবে। পরচর্চার সময় থাকবে না। সিনেমার টিকিট পেতে হলে চরকার সূতো দাখিল করতে হবে। পরিবারের সকলে যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে খায় তা হলে রান্নার সময় পাচে, কয়লার খরচও। কয়েকটি পরিবার মিলে একসঙ্গে রান্নার আয়োজন করতে পারেন। রোজ না হোক হপ্তায় এক দিন।

ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। যুদ্ধে যোগদান করব না এই যদি হয় সংকল্প তা হলে তার আনুষঙ্গিক আর্থিক বিপর্যয় আমাদের অকল্যাণ করবে না। বরং আমরা সেই সুযোগে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করব। সে ব্যবস্থার সার কথা, যে কাজ করতে চায় সে কাজ পাবে, যে কাজ করতে চায় না সে দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাবে। আমরা কাউকে বসে থাকতে দেব না। এমন কি সাধু সন্ন্যাসীকেও না। তাঁরা ইচ্ছা

প্রত্যয়

করলে হিমালয়ে যেতে পারেন, কিন্তু লোকালয়ে থাকলে কাজে হাত লাগাতে হবে। কয়েক জন খাটবে আর বাকী সকলে থাকবে, এ ব্যবস্থা আমাদের পারিবারিক জীবন দুর্বল করেছে, আমাদের জাতীয় জীবনকেও দুর্বল করে তুলবে। যারা রেশন পাচ্ছে তারা খেটে খাচ্ছে কি না খবর নিতে হবে। যদি দেখা যায় খাটছে না তা হলে খাটুনির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা যে কলকাতা শহরেই হবে এমন কোনো কথা নেই। অধিকাংশকেই গ্রামে চালান দিতে হবে। না গেলে রেশন মিলবে না।

এ দেশের প্রধান শত্রু জড়তা। স্বাধীন হয়েও এর জড়তা কাটেনি। জড়তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্ধ কুসংস্কার। ধর্মের নামে তার অসীম প্রতিপত্তি। সে যদি দেশের চিত্ত অধিকার করে থাকে তা হলে আমাদের জড়তা ও আমাদের নৃচতা মিলে আমাদের দুই হাত ও দুই পা জড়িয়ে ধরবে। আমরা খাটতে পারব না, আমরা হাঁটতে পারব না। কেবল বক্তৃতা দেব, কেবল বিবৃতি ছাপাব। তার পর অবস্থা যখন ঘোরালো হয়ে উঠবে তখন ফস্ক করে এক দিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব। যেন যুদ্ধই হচ্ছে সব সমস্তার সমাধান।

অবশ্য আমি ধরে নিয়েছি যে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। অনেকের বিশ্বাস দু'পক্ষেরই যখন আণবিক বোমা আছে তখন কেউ সাহস করে লড়াই শুরু করবে না। কিন্তু জার্মানী কি জানত না যে প্রতিপক্ষের বিষবাম্প আছে? কেন তা হলে লড়াই শুরু করল? করল এই জন্তে যে সেই মুহূর্তে তার বল ছিল তার প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশী। দেরি করলে তার প্রতিপক্ষের বল তার চেয়ে বেশী হতো। অর্থাৎ

প্রত্যয়

তার প্রতিপক্ষের বল যে হারে বাড়ছিল তার নিজের বল সে হারে বাড়ছিল না। বলপরীক্ষায় সে হেরে যেত, যদি দেরি করত। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল এই জন্তে যে তাড়াতাড়ি শুরু করলেও তাড়াতাড়ি সারা করতে পারল না। সারা করতে তার যতই দেরি হতে থাকল তার প্রতিপক্ষের বল ততই বাড়তে থাকল। আসছে বারের যুদ্ধ সেই আরম্ভ করবে যার বল একটা বিশেষ মুহূর্তে প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশী থাকবে, পরবর্তী মুহূর্তে থাকবে না। আণবিক বোমাই সামরিক বলের একমাত্র মাপকাটি নয়। ছ'পক্ষের বল যদি সমস্তক্ষেণ সমান থাকে তা হলে অবশ্য কেউ আরম্ভ করবে না, উভয়েই অপেক্ষা করবে। কিন্তু বল কখনো সমস্তক্ষেণ সমান থাকে না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য।

যদি না ইতিমধ্যে অন্তঃপরিবর্তন ঘটে। তার সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। গান্ধীজী আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন অন্তঃপরিবর্তনে বিশ্বাস রাখতে। আমরা বিশ্বাস রাখব।

(১২৫০)

আমি কী বিশ্বাস করি ও করিনে

যে কথা আমি বিশেষ করে বলতে চাই সে কথা বলার সময় হয়তো পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু সে কথা বলতে পারছি। আমার কণ্ঠস্বর আমাকে অর্জন করতে হবে তার আগে। যার কণ্ঠস্বর নেই তার কথা হাজার ভাষা হালও কেউ কান দিয়ে শোনে না। বন্ধুরা বাথা পায়, শত্রুরা ব্যথা দেয়, জনতা যেমন উদাসীন তেমনি উদাসীন থাকে।

এইজগতে আমি নীরব। কিন্তু নীরবতাও শ্রেয়স্কর নয়। লোকে ভুল বুঝতে পারে। অনর্থের দিন যে মানুষ মৌনব্রত অবলম্বন করে তার উপর অবিচার হওয়া স্বাভাবিক। যে লেখক দুনিয়ার আর সমস্ত বিষয়ে লিখছে অথচ নিজের দেশ সম্বন্ধে লিখছে না সে তার কর্তব্য করছে কি না এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে যদি কোনো বিষয়ে কিছু না লিখত, লেখা একদম বন্ধ করে দিত, তা হলে হয়তো জবাবদিহির দায়ে পড়তে হতো না। পড়লে উত্তর দেওয়া যেত, আমি তো আর লেখক নই, আমি দর্শক।

এসব ভেবে আমাকে অকালে মৌনভঙ্গ করতে হচ্ছে। কিন্তু অল্পস্বল্প মৌনভঙ্গ। এর বেশী করা উচিত নয়। এটুকু যে করছি এ শুধু নিজের উপর অবিচার থগাতে।

প্রত্যয়

আমি বিশ্বাস করি যে বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলেই বাঙালী ও সকলে মিলে একজাতি। দেশ ভাগ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু জাতি ভাগ হয়নি। জাতি ভাগ করা শিবের অসাধ্য। যা হবার নয় তা হবেও না। মাঝখান থেকে অনাবশ্যক দুঃখ পাবে কয়েক লক্ষ অভাগা। তাদের দশা এখন গিনিপিগের মতো। তাদের উপর দিয়ে যে যা খুশি পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব পরীক্ষার একমাত্র মূল্য এগুলির ব্যর্থতা সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ। তারা একদিন শিখবে যে ঘরবাড়ী ছেড়ে দৌড় দিলে লাভ যা হয় তার চেয়ে লোকসান হয় অনেক বেশী। প্রাণ হয়তো বাঁচে, কিন্তু ভিতরের মানুষটা মরে যায়। অমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে ঘরবাড়ী মান ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া ভালো। শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষাই মনে বসবে। তখন দৌড়াদৌড়ি আপনি কমে আসবে। তখন ঘরবাড়ী মান ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেবার প্রতিজ্ঞা মনে জাগবে। ছ'চার হাজার লোক প্রাণ দেবেও। তাদের প্রাণদান হবে এদের পলায়নের চেয়ে অনেক বেশী মহনীয়, অনেক বেশী কলপ্রদ। সারা জগতের মুখ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাদের বীরত্ব। অত্যাচারী তখন মুখ দেখাতে পারবে না। অত্যাচার অস্ত হবে। যে যার নিজের ভিটায় বাস করবে, নিজের বৃত্তি অন্নস্বরণ করবে। জাতি যদি ভাগ না হয় তা হলে একদিন একজাতিবোধ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টানকে একত্বত্রে বাধবে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাদের আলাদা করে রাখতে পারবে না। গবর্ণমেন্ট আলাদা হতে পারে, কিন্তু জীবন আলাদা হবে না। প্রকৃতি যাদের এক করেছে মানুষ তাদের

প্রত্যয়

ভিন্ন করতে পারে না। তা যদি পারত তবে হাজার বছরের ইতিহাস অল্প রকম হতো।

ফরাসীরা বলে থাকে তাদের দেশ এক ও অবিভাজ্য। আমিও এককালে বলেছি বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। এখনো আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে চোখে যা দেখছি তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। তা বলে আমি গায়ের জোরে তার মানচিত্র বদলে দিতে চাইনে। প্রথমত, আমি গায়ের জোরে বিশ্বাস করিনে। অমন করে কিছু সাময়িক স্মরণ হতে পারে, কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে আবার এ দেশ ভাগ হবে, যদি ভাগাভাগির মনোভাব অতৃপ্ত থেকে যায়। লীগপন্থী মুসলমানদের বন্ধমূল ধারণা চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু হিন্দুদের একচেটে, স্বাধীনতার আন্দোলনে বোগ দিচ্ছে হিন্দুদের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে পাটা আন্দোলন করে ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া যাবে তার চেয়ে আরো বেশী, দেশ যদি ভাগ হয়ে যায় তা হলে তো দেশের একাংশের শিক্ষাদীক্ষা চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্য সব কিছু হবে মুসলমানের একচেটে। এই যে বন্ধমূল ধারণা একে গায়ের জোরে উন্মূল করা যায় না। সাধারণ মুসলমানকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে শিক্ষাদীক্ষায় চাকরিবাকরিতে ব্যবসাবাণিজ্যে তার যেমন ভাগ নেই তেমনি সাধারণ হিন্দুও ভাগ নেই। অধিকাংশ হিন্দুই অধিকাংশ মুসলমানের মতো ভাগ্যহীন। এর যদি কোনো প্রতিকার থাকে তবে তা দেশবিভাগে নয়, জাতিবিভাগে তো নয়ই। সাধারণ মুসলমান যেদিন বুঝবে যে দেশবিভাগ করে লাভ যা হয়েছে তা সাধারণের নয়,

প্রত্যয়

অসাধারণদের, সেদিন সে নিজেই পাকিস্থানের প্রতিবাদ করবে। আর যদি বাস্তবিক সাধারণ মুসলমানের তাতে উন্নতি হয় তবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রতিবাদ আমরা তা প্রত্যাখ্যার করব। কিন্তু সে উন্নতির অংশ সাধারণ হিন্দুও যেন পায়। সাধারণ হিন্দুকে বঞ্চিত করে সাধারণ মুসলমানের যে উন্নতি বা সাধারণ মুসলমানকে বঞ্চিত করে সাধারণ হিন্দুর যে উন্নতি তা এমন অস্বাভাবিক যে তা কিছুতেই সম্ভব হবে না, যদি হয় তো স্থায়ী হবে না।

দ্বিতীয়ত, অনেক দিন থেকে আমার বিশ্বাস কলকাতা বাংলাদেশের ধনসম্পদ হরণ করে এনে স্বর্ণলঙ্কার মতো ভোগ করছে, তার ফলে পূর্ববঙ্গেরই ক্ষতি হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না পেলে পূর্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গ শিল্পে বাণিজ্যে অগ্রসর হতে পারবে না। সাধারণের অবস্থার উন্নতি হবে না। তারা কেবল কাঁচামাল জোগাবে ও তৈরি মাল কিনবে। তাদের জগ্রে কেউ কোনোদিন ভাবেও না। জাতীয়তাবাদীরা সবাই এসে জুটেছেন স্বর্ণলঙ্কার। যে চিন্তা আমার মনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আকারে অস্পষ্ট ভাবে ঘুরত সেই চিন্তাই এক দিন পাকিস্থান-রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাকেই দিল মর্মান্তিক আঘাত। থাকা সামলাতে আমার ছুঁতিন বছর লাগল। এত দিনে আমি উপলব্ধি করেছি যে পূর্ব বঙ্গের উত্তর বঙ্গের শিল্প বাণিজ্য একটু আলাদা থাকলেই জমবে ভালো। চট্টগ্রাম একদিন বড় বন্দর হবে। ঢাকা হবে বড় শিল্পকেন্দ্র। খুলনা বয়িশাল সিলেট সিরাজগঞ্জ সব একে একে মাথা তুলবে। তার ফলে হয়তো কলকাতার মাথা হেঁট হবে। কিন্তু বাঙালী জাতির সারা শরীরে

প্রত্যয়

বক্তা চলাচল করবে। বাংলাদেশকে সর্বাঙ্গপুষ্ট করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া উপায় নেই। পূর্ববঙ্গকে পৃথক করে বিধাতা তার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। এটা ইতিহাসের ইচ্ছা। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। আমার ভাড়া হৃদয়কে এই বলে আমি সান্ত্বনা দিয়েছি। আর আমি পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবিনে। আগে উভয় প্রদেশের শিল্পবাণিজ্য সমান উন্নত হোক। আগে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান আর একটু বাড়ুক। আগে হিন্দু মুসলমানের ঈর্ষান্বিত আর একটু কমে। তাপ পরে বাংলাদেশের ভৌগোলিক এক্য কার সাধ্য ঠেকায়! এদেশ এক এবং অবিভাজ্য ছিল এবং হবে। কিন্তু নাক্ষত্রিকার এই ভাঙনটায় বিধাতার ইচ্ছায় ঘটেছে। মানুষের ইচ্ছা যেন এর সঙ্গে শক্ততা না করে। এর কাজ শেষ হয়ে গেলে এ আপনি চলে যাবে।

আমি বিশ্বাস করিনে যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করার জন্তে যুদ্ধ বাধানো দরকার। যুদ্ধ যদি বাধে সারা ভারত ও সারা পাকিস্তান জুড়ে বাধবে, হয়তো সারা দুনিয়া জুড়ে। নারী যুদ্ধ সব সমস্তার সম্মুখীন হয়ে দুদিনেই মৃত্যু ভুলে যাবে পূর্ববঙ্গের হামলা। যুদ্ধ হয়তো পর্যবসিত হবে বিপ্লবে! তখন কে কাকে আশ্রয় দেবে! এখন যাবা আশ্রয়দাতা তখন তারাও হবে আশ্রয়প্রার্থী। কেঁচো খুড়তে গিয়ে কেউটির ছোবল খেতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান এখনো ইচ্ছা করলে মিটমিট করতে পারে। এটা বাঙালীর ধরোয়া ব্যাপার। এর জন্তে

প্রত্যয়

করাচীর বা দিল্লীর দ্বারস্থ হওয়া লজ্জার কথা। হৃদয়ে প্রেম থাকলে, মস্তিষ্কে শুভবুদ্ধি থাকলে ঢাকা ও কলকাতা ডান হাত ও বাম হাতের মতো অঞ্জলিবদ্ধ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঘটবেও তাই। আমি বিশ্বাস করিনে যে বাঙালীর ঘরোয়া ঝগড়া আর কেউ মিটিয়ে দিতে পারবে। বা আর কেউ এর দরুন যুদ্ধে নামতে রাজি হবে। যারা চুক্তির উপর ভরসা রাখেন ও যারা যুদ্ধের উপর বাজি রাখেন তাঁদের উভয়ের কপালে আছে হতাশা। অবাঙালীরা একদিন সরে দাঁড়াবেন, তখন বাঙালীরই উপর পড়বে সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যেদিন আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধ জন্মাবে সেদিন প্রেমও জাগবে, শুভবুদ্ধিও সক্রিয় হবে। তখন ঘটবে অঞ্জলিবদ্ধতা।

কিস্ত কবে?

এর উত্তরে আমি আবার মৌন অবলম্বন করলুম।

(১৯৫০)

সংশয়বাদী

সংশয়বাদী ঘাড় নেড়ে বললেন, “তোমরা রাজ্য চালাতে পারবে না হে, পারবে না। এই না সেদিন বললে, আরো ফসল ফলেছে, খাতের দোড়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। আজ শুনিছি চালের মণ চল্লিশ টাকা। কোথায় কোরিয়া বলে একটা ছোট উপদ্বীপ আছে, সেখানে লড়াই বেধেছে বলে বাজার থেকে গমপত্র উধাও, তার মানে চোরাবাজারে তার দাম চার পাঁচ গুণ। বাড়ীতে মশলা কেনা বন্ধ, সিদ্ধি পাচ্ছি। এখন থেকে এই, এর পরে দুক্ক যখন ছড়াবে তখন সিদ্ধি খাওয়া চলবে কিনা সন্দেহ। কাঁচা পেতে হবে বোধ হয়। না, খাওয়া দাওয়া ঘুচে যাবে?”

বন্ধু বললেন, “তুমি কেবল খারাপটা দেখ। ভালো কিছু তোমার চোখে পড়ে না। এই বে আমরা এত বড় একটা সাম্রাজ্য চালাচ্ছি, যাকে বলা হতো ভারত সাম্রাজ্য, কেবল ব্রিটিশ আমলে নয়, মোগল আমলে, এর জন্তে আমরা ট্রেনিং পেলুম কবে! বিনা তালিমে মোটর চালাতে গেলে কী হয় জানো তো। শাসনযন্ত্র তার চেয়েও জটিল। আমরা যে এখন পর্বন্ত গ্যাকসিডেন্ট বাপাইনি এর জন্তে কেউ আমাদের ধন্যবাদ দেবে না। শুধু দোষ ধরবে। যত সব ছিদ্রাশ্বেষীর দল!”

সংশয়বাদী বললেন, “আহা রাগ কর কেন? স্বাধীনতার আগে

প্রত্যয়

এক বছর ও পরে তিন বছর মোট চার বছর তোমরা মোটর চালাচ্ছ দিল্লীর ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে। তালিমের জন্তে এর চেয়ে বেশী সময় কে কবে পেয়েছে! তুমি যদি মনে করে থাক যে অভিজ্ঞতার অভাবে জিনিসপত্রের দাম কমছে না, বরং বাড়ছে, তা হলে তুমি ভুল বুঝেছ। এটা অভিজ্ঞতার অভাবে নয়, এর অন্য কারণ আছে।”

“কী কারণ?” বন্ধু প্রশ্ন করলেন।

“সে কথা যদি বলি,” সংশয়বাদী উত্তর করলেন, “তোমরা আমাকে কমিউনিষ্ট বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। সেইজন্তে আগে জানতে চাই, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?”

“তুমি যে কমিউনিষ্ট নও তা সকলে জানে। স্তবরাং নির্ভয়ে বলো।”

“তা হলে শোন।” সংশয়বাদী বলতে আরম্ভ করলেন “দু’রকম ক্ষমতা আছে। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক। বণিকের মানদণ্ড আর সম্রাটের রাজদণ্ড। ইংরেজ যখন ছিল তখন তার হাতে ছিল উভয়বিধ দণ্ড। কবির ভাষায়—

‘বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী

রাজদণ্ড রূপে!’

তার মানে যে বণিক সে-ই রাজা, যে রাজা সে-ই বণিক। রাজ্যে বাণিজ্যে একাকার। কিন্তু ইংরেজ যখন চলে গেল তখন তার রাজদণ্ড পড়ল এক দল লোকের হাতে, মানদণ্ড পড়ল আর একদল লোকের হাতে। কেবল যে কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতা পেলেন তা নয়, স্বাধীনতা পেলেন

প্রত্যয়

দেশী ধনিকরাও। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বসর্বা। কেউ তাঁদের গায়ে হাত দিতে সাহস পান না। নেতারাও না। নেতাদের সম্বন্ধ থাকতে হলো রাজনীতি ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে। সে ক্ষমতা এত বেশী ক্ষমতা যে তাই নিয়ে সম্বন্ধ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে দু'শ বছর কাটিয়ে আমাদের ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে রাজ-দণ্ড ও মানদণ্ড একই লোকের হাতে থাকা সম্ভব ও সম্ভবত। এত কালের বদ্ধমূল ধারণা তিন বছরেও উৎপাত হলো না। এখনও আমরা আশা করছি রাজশক্তি আমাদের ভাত কাপড়ের অভাব দূর করবে। কিন্তু পারবে কী করে? তার হাতে যে বণিকের মানদণ্ড নেই। কোনো দিন যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তার হাতে আসবে সে ভরসাও আর নেই। যাদের হাতে আছে সে ক্ষমতা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে লোকের দোঁটুকু উপকার করা যায় সেটুকু সে করছে ও করবে। কিন্তু তাতে লোকের পেট ভরে না। লোকে বুঝতে পারে না যে এরা ইংরেজ নয়, এরা উভয়ই সর্বসর্বা নয়। এরা চোরাকারবার বন্ধ করতে পারে না, সে ক্ষমতা এদের নেই। যাদের আছে তারা বন্ধ করবে না, কারণ সেই ভাবেই তারা নিজেদের মূলধন বাড়ায়। মূলধনই তো তাদের ক্ষমতার মূল। তারা তাদের ক্ষমতার মূলে আঘাত করবে কোন্‌ ছুঁখে! তাদের বাধ্য না করলে তারা কিছু করবে না। কিন্তু তাদের বাধ্য করা কারো সাধ্য নয়। যত দিন না এমন একটা গবর্ণমেন্ট হচ্ছে যার হাতে উভয়বিধ দণ্ড তত দিন আমাদের চোরাবাজারের প্রজা হয়েই বাঁচতে এবং মরতে হবে।”

প্রত্যয়

বন্ধু বললেন, “এ তোমার অত্যন্ত অগ্রায়। চোরাবাজার কোন দেশে নেই? আছে অমিকশাসিত ইংলণ্ডেও। এটা যুদ্ধের অনুষঙ্গ।”

“কিন্তু রাশিয়ায় নেই। কেউ বলছে না যে নতুন চীন রাষ্ট্রে আছে।”

“খোঁজ নিলে দেখবে সেখানেও আছে। হয়তো কম, তবু আছে ঠিক। উৎপাদন বতাই বাড়তে থাকবে চোরাকারবার ততই কমতে থাকবে। এটা সময়সাপেক্ষ।”

“উৎপাদন বাড়তে দেওয়া ওদের পক্ষে লাভজনক নয়। কম উৎপাদনেই ওদের বেশী লাভ। উৎপাদন বাড়বে বলে যদি আশা করে থাকে। তবে তুমি হতাশ হবে এক দিন। বাড়বে অগ্নিশস্ত্রের উৎপাদন : অগ্নিবস্ত্রের নয়।”

“তুমি দেখছি সত্যি কমিউনিষ্ট। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।”

“জানতুম তুমি শেষ পর্যন্ত ঐ অপবাদ দেবে। যুক্তির বদলে কটুক্তি।” এই বলে তিনি গা তুললেন।

বন্ধু বললেন, “আরে বোস, বোস। অমনি রাগ করা হলো। তুমি কি বলতে চাও অর্থনৈতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই বা আসবে না?”

“তোমাদের হাতে থাকলে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। নেই তা তো জাজ্জল্যমান! আসবে কিনা সেটা অবশ্য বিতর্কের যোগ্য। তুমি বলবে, আসবে। আমি বলব, আসবে না। তুমি রাগ করে বলবে,

প্রত্যয়

কমিউনিস্ট। আমি রাগ করে বলব, পেতি বুর্জোয়া। যত রকম কটুক্তি। সময়ে বোঝা যাবে কার যুক্তি ঠিক।”

বিহু এতক্ষণ বিনা বাক্যে শুনে যাচ্ছিল। বন্ধু বললেন, “আচ্ছা, বিহুকে সালিশী মানা যাক। কী বলো বিহু? অর্থনৈতিক ক্ষমতা কি ইংরেজ আমাদের হাতে দিয়ে যায় নি? কার হাতে দিয়েছে তা হলে?”

“অর্থনৈতিক ক্ষমতা,” বিহু বলল, “কেউ কাউকে দেয় না, দিতে পারে না। ওটা শাসনবস্ত্রের সামিল নয়, শাসনযন্ত্রের অতিরিক্ত। তোমরা চেয়েছিলে শাসনযন্ত্র, তার অতিরিক্ত পাবে কী করে?”

“ওটা তা হলে আছে কার হাতে?”

“কিছুটা ইংরেজের হাতে, বাকীটা দেশী ধনিকদের হাতে।”

“তাদের হাত থেকে আসবে কী করে?”

“তার উত্তর,” বিহু হেসে বলল, “মার্কস্ দিয়ে গেছেন এক ভাবে, গান্ধী দিয়ে গেছেন আরেক ভাবে, ব্রিটিশ লেবার পার্টি দিচ্ছে আরো এক ভাবে। তোমাদের বিশ্বাস তোমরা চতুর্থ একটা উপায় জানো।”

সংশয়বাদী বললেন, “চতুর্থ উপায় তো চোরের সঙ্গে সমঝোতা। অর্থাৎ চোরাই টাকার উপর ট্যাক্স বসানো। তারপর চোরকে ডেকে বলা, দিয়ে যাও বাপু যে যা পারো। আইন তোমাদের জগ্রে নয়।”

বিহু বলল, “তুমি হয়তো অবিচার করলে। যারা রাজ্যের ভার নিয়েছেন তাঁরা যা ভালো বিবেচনা করেন তা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অমন করে তাঁদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা আসবে কি না। যদি আসে তো কবে আসবে? কেমন?”

প্রত্যয়

বন্ধু বললেন, “হাঁ এই আমার প্রশ্ন।”

বিশ্ব বলল, “দ্বার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও ওই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। ইতিহাস তাদের স্বযোগ দিয়েছিল বায়ো ওরো বছর। তারা উত্তর দিতে পারল না বলে ইতিহাস তার পরে স্বযোগ দিল নাৎসীদের। ভারতবর্ষে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা ইতিহাস জানে। অর্থাৎ ভগবান জানেন।”

“ভগবান!” সংশয়বাদী বললেন, “কেন পেচারাকে টেনে আনছ এর মধ্যে! আর ইতিহাস! ইতিহাস কি নাৎসীদের সাফ করে দেয়নি?”

“তার মানে,” বন্ধু বললেন, “তুমি বলতে চাও যে নাৎসীরা এদেশে কোনো স্বযোগ পাবে না। পাবে কমিউনিস্টরা?”

“আরে, না, না।” সংশয়বাদী সম্মত হয়ে বললেন, “এখানেও নাৎসীরা ঘোলা জলে মাছ ধরবার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তাদের ভুলে তোমার কেন এত দরদ!”

“হাঁ! আমাদের নাৎসী বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে!” বন্ধু গোসা ফরলেন।

বিশ্ব বলল, “থাক, অমন করে পরস্পরকে আক্রমণ করে প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কথা হচ্ছে। গান্ধীজী জানতেন যে নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতায় দেশের কোটি কোটি লোকের পেট ভরবে না। সেইজন্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংবেজের কাছে নয়। তিনি জানতেন যে ইংরেজ তা দিতে পাবে না। সেইজন্তে দেশের লোককে বলেছিলেন, তোমরা মিল ফ্যাক্টরীর উপর

প্রত্যয়

নির্ভরতা ছাড়ে। দরকারী জিনিসের জন্তে ধনিকদের উপর নিভর কোরো না। ওদের মুখাপেক্ষী হলে ওরাই তোমাদের প্রভু হবে। তখন কোন কাজে লাগবে রাজনৈতিক ক্ষমতা! অল্পে বঞ্চে স্বাবলম্বী হও। তা হলে দেখবে ওরাই তোমাদের দ্বজার ধর্মা হবে। আজ গাঞ্চীজী নেই। কিন্তু তার শিক্ষা তো আমরা ভুলে বাইনি। জিনিস পত্রের দর বাড়ছে, লোকে ভাবছে আরো বাড়বে। আতঙ্কিত হয়ে দরকারের চেয়ে আরো বেশী কিনছে। ফলে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে দর। এক্ষেত্রে কর্তব্য দরকারের চেয়ে বেশী না কেনা। সম্ভব হলে আদৌ না কেনা। এর নাম অহিংস অসহযোগ। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। এই অবসরে প্রত্যেকটি দরকারী জিনিস যাতে ঘরে ঘরে বা গ্রামে গ্রামে তৈরি হয় তার জন্তে কোমর বাঁধতে হবে।”

বন্ধু এর জন্তে প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, “এটা একটা উত্তরই নয়।”

সংশয়বাদী বললেন, “এইবার তোমার সঙ্গে আমি একমত।”

বিলু বলল, “বেশ তো। একজন যাও মার্কসের কাছে, একজন যাও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের কাছে। তার পরে যা হবার তা হোক। ভারতের কপালে আছে একটা লঙ্কাকাণ্ড বা কুরুক্ষেত্র। যিনি নিবারণ করতে পারতেন তিনি খুন হয়েছেন। বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা নয় যে কেউ নিবারণ করে। আমি আমার সাহিত্যে মন দিতে চাই। কুরুক্ষেত্রের আগে যেন আমার কাজ আমি সেরে রাখতে পারি।”

(১৯৫০)

দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম

ইংরেজীতে দুটি শব্দ আছে—পেট্রিয়টিজম ও গ্রাশনালিজম। পেট্রিয়টিজম মানে দেশপ্রেম। গ্রাশনালিজম মানে জাতিপ্রেম। দেশপ্রেম যে কী বস্তু তা আমরা অনেকদিন পরাধীন থেকে অনেক দুঃখ পেয়ে অনেক দিন সংগ্রাম করে হৃদয়ঙ্গম করেছি। কিন্তু জাতিপ্রেম যে কাকে বলে তা আমাদের এগনো শিগতে বাকী। শিগা তো বিনা দুঃখে হয় না। বহু দুঃখ আছে আমাদের কপালে।

এ দেশে এমন লোক এখনো আছে—তাদের সংখ্যাই বেশী—যারা জাতি বলতে বোঝে ব্রাহ্মণ বৈজ্ঞ কায়স্থ ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতে আজকাল জাত দেখে স্কুল কলেজে ভর্তি করা হয়। চাকরির বাজারেও জাত যাচাই করা হয়, যেমন বিয়ের বাজারে। শুনতে পাই বিহারেও পদোন্নতি হয় জাত বিচার করে। অনেক দিন পর্যন্ত একটি উচ্চ পদ খালি ছিল কোন্ জাতের লোককে নিয়োগ করা হবে তা নিয়ে মতভেদ ছিল বলে। তা হলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিতদের মনে স্বাধীনতার রং ধরেনি। নিরক্ষরদের মনে তো নয়ই। মুসলমানের উপর রাগ করে হিন্দু জাতি বলে একটা কিছু ক্রমশ দানা বাধছে। হিন্দু জাতীয়তার কথা ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তা আমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠতে পারছে না। ভারতীয় জাতীয়তা দূরের কথা, বাঙালী জাতীয়তাও ধোপে টিকছে কই?

প্রত্যয়

বাঙালী জাতি বলে যদি কোনো জাতি থাকে তবে মুসলমান তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলমানকে তার থেকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না, দিলে বাঙালী জাতি বলে কিছু থাকে না, থাকে হিন্দু জাতি। অথচ লীগপন্থীদের মতো কংগ্রেসপন্থীদের কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন যে লোকবিনিময়ের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের বাদ দিতে হবে, পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের বাদ দিতে হবে। সমাজতন্ত্রীদের কেউ কেউ সমর্থন করছেন এ প্রস্তাব। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে চোখে পড়ে লোক বিনিময় আপনা আপনি হয়ে যাচ্ছে। এ যে কিছুদিন পরে বন্ধ হবে তার লক্ষণ নেই; এর ফলে বাঙালী জাতি বলতে বোঝাবে হিন্দু জাতি। মুসলমানদের নিয়ে গড়ে উঠবে পাকিস্থানী জাতি। জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বই জয়ী হবে। গান্ধীজীর একজাতিতত্ত্ব ও তার জন্তে তাঁর জীবনবলি ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হবে শচীন্দ্রের প্রাণদান, স্মৃতিশের প্রাণদান।

এসব দেখে শুনে আমার মনে হয়, আমাদের দেশপ্রেম খাটি ছিল বলে দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু আমাদের জাতিপ্রেমে খাদ ছিল, তাই দেশ খণ্ডিত হলো। খাদ যতদিন থাকবে খণ্ডন ততদিন থাকবে। বাহুবল দিয়ে এর সংশোধন হবে না। বাহুবলের দ্বারা দেশকে এক করতে পারা যায়, কিন্তু জাতিকে এক করা সম্ভব নয়। তার জন্তে চাই প্রেম। যেখানে প্রেম নেই সেখানে একজাতি নেই, থাকতে পারে এক দেশ, কিন্তু তার স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। আমরা দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু সামনে রয়েছে আর একটা পরীক্ষা। সেটা জাতিপ্রেমের। তাতে যদি ফেল করি তা হলে আমাদের স্বাধীনতা

প্রত্যয়

বিপন্ন। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এর তাৎপৰ্য বুঝবেন না। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও যদি সমান অবস্থা হন তা হলে স্বাধীনতার আয়ুষ্কাল আড়ালে গুনে বলা যায়।

এমন দেশ নেই যে দেশের ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ বা গৃহবিবাদ ঘটেনি; ইংলণ্ডে ঘটেছে, আমেরিকায় ঘটেছে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রাশিয়ায় ঘটেছে, এই সেদিন চীনে ঘটল, এইমাত্র কোরিয়ায় ঘটেছে। তা বলে কেউ কি কোনো দিন লোকবিনিময়ের কথা মুখে এনেছে? এ কথা যারা ভাবতে পারে তারা স্বাধীনতার দার ধারে না। পুরুষানুক্রমে পরাধীন না হলে এমন অমঙ্গলের কথা কেউ মুখে ধরে না। এটা দেউ দাসমনোভাব য স্বাধীনতার পরেও কাজ করেছে। ভারত ও পাকিস্থান একই দেশের দুই স্বতন্ত্র খণ্ড। এরা যদি যুদ্ধ করে তা হলে সেটা হবে গৃহযুদ্ধ। এত দিন যা করে এসেছে তা গৃহবিবাদ। এর দরুন লোকবিনিময়ের প্রস্তাব তোলা ইতিহাসে অপূৰ্ব। যে পথ দিয়ে লোকজন চলে যাচ্ছে সেই পথ দিয়ে ভারতীয়তাও চলে যাচ্ছে। এটুকু বোঝাবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিও যদি না থাকে তবে ভাবনার কথা বৈকি। তাদের বদলে যেদব লোকজন চলে আসছে তারা এলে আমরা ভারতীয় হব না, হব হিন্দু। সেভাবে যদি স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো তা হলে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার উৎপত্তি হতো না, হিন্দু মহাসভাই দেশকে স্বাধীন করত। সে ভাবে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করাও সম্ভব নয়।

আমরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী হব না ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হব এ বিষয়ে অবিলম্বে মনঃস্থির করতে হবে। যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী

প্রত্যয়

হব বলে স্থির করি তা হলে তৎক্ষণাৎ লোকবিনিময় বন্ধ করতে হবে।
এ খেলা বেশী দিন চলতে পারে না, কারণ এর দরুণ আমরা স্বাধীনতার
অযোগ্য হয়ে পড়ছি। আমরা যদি একজাতি হয়ে থাকি তা হলে
লোকবিনিময়ের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আর যদি দুই জাতি হয়ে
থাকি তা হলে দেশ বিভাগ তার অনিবার্য পরিণাম, লোকবিনিময় তার
পরবর্তী পরিচ্ছেদ, যুদ্ধবিগ্রহে তার পরিসমাপ্তি, তার উপসংহার স্বাধীনতা
বিসর্জন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পর বিজয়া দশমী। আমরা একজাতি
না দুই জাতি এইটেই আসল প্রশ্ন।

(১৯৫০)

চিড়িয়াখানা

দাদা বললেন, “ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ভারতবর্ষ নাকি মণ্ড বড় একটা সমস্তার সমাধান করতে পেনেছে, আর কোনো দেশ যা পারেনি। নানা বিচিত্র বেশভূষা, নানা বিচিত্র প্রথা, নানা বিচিত্র জাতি, ধর্ম, ভাষা। ভারতের সাধনা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে সমন্বয়ের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করা। এই সাধনায় ভারত সিদ্ধিলাভ করেছে। শুধু ইংরেজের চক্রান্তে তার শাস্তিভঙ্গ হচ্ছে। ইংরেজকে তাড়িয়ে দাও। দেখবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই। থাকবে কী করে? ভারত যে সমন্বয়ের দেশ! এখন দেখছি সমাধান যে করেছিল সে ভারত নয়, সে ভারতের ব্রিটিশ সরকার। যা দিয়ে করেছিল তা সমন্বয়ের আদর্শ নয়, তা নাক্স তলোয়ার। ব্রিটিশ বেয়োনেট সরে গেছে, তাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা পাঞ্জাবকে বিধ্বস্ত করেছে, বাংলাকে করেছে। ইংরেজ আমলে যা ঘটেছিল সে আর কতটুকু! তারা যেতে না যেতে যা ঘটল তা ইতিহাসে অপূর্ব। কেবল ভারতের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে। পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান-শিখ হুনিয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শুধু নরহত্যা নয়, নারীধর্ষণে, গৃহদাহে, লুণ্ঠনে। আমরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যোদ্ধা জাতি নই বলে ওদের রেকর্ড ভাঙতে পারি নি, তা হলেও যা করেছি তা বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আমাদের আফসোস এই যে,

প্রত্যয়

ফস্ করে একটা চুক্তি করে দিল্লী ও করাচীর দুই সরকার আমাদের দুই হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়েছে। দুই জানোয়ারকে যেমন খাঁচায় পুরে তাদের রক্ষকরা পাহারা দেয় তেমনি কণ্ঠে পাহারা দিচ্ছে জবহরলাল ও লিয়াকৎ আলি। চিড়িয়াখানার শান্তি ও শৃঙ্খলা যেমন উপর থেকে চাপানো, লোহার খাঁচার ভিতর পুরে তালি বন্ধ করে বাইরে গুলীভরা বন্দুক হাতে টহল দিয়ে আগলানো—আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলাও তেমনি। প্রহরী যদি একটু অসতর্ক হয় তা হলে প্রলয়কাণ্ড বেধে যাবে। চিড়িয়াখানার বাঘ, সিংহ, কুমোর, অজগর মিলে আর সবাইকে নিয়ে মোচ্ছব শুরু করে দেবে। এই আমাদের বাংলা দেশ। এ-দেশের হিন্দু-মুসলমান এক দিন ক্লাইভের সঙ্গে লড়েছিল। এই দেশের ছেলে স্ত্রীষ হিন্দু-মুসলমানে। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ইংরেজকে আক্রমণ করেছিল। বিশ্বাস হয় তোমাদের?”

আমরা নিঃশব্দে শুনেছিলুম। বলবার ছিল অনেক কথা, প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দাদা আর কাউকে বলতে দেবার পাত্র নন। নিজেই বলে চললেন আবার, “এখন এই তো অবস্থা। আগে একটা আশাভরসা ছিল। ইংরেজ খাজার হোক বিদেশী। সে চিরদিন থাকবে না। কিন্তু এরা আমাদের স্বদেশী শাসক। এদের বলতে পারিনে যে, চলে যাও। থাকো, একথাও বলতে পারছি কই? দোটারান্ন পড়েছি।”

দাদা বিমর্ষভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তখন স্বরজিৎ বললেন, “দাদা, সত্যি করে বলুন দেখি, আপনি কী চান? কী হলে খুশি হন?”

“শান্তি। আমার প্রাণ চায় শান্তি। আমার চোখের সামনে

প্রত্যয়

আমার দেশ ছারখার হয়ে যাচ্ছে, আমার জাতি আত্মহত্যা করছে, দেখছি আর দেখে কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হচ্ছি। তা বলে চাপানো শান্তি চাইনে। বেয়োনেটের শান্তি, কবরের শান্তি যথেষ্ট হয়েছে। তেমন শান্তির উপর ঘেন্না ধরে গেছে। তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো। আমি চাই সমন্বয়ের শান্তি, সামঞ্জস্যের শান্তি, আন্তরিক শান্তি, স্বতঃস্ফূর্ত শান্তি। যে শান্তি বাইরের প্ররোচনায় ভাঙবে না, পরের চক্রান্তে টুটবে না।”

স্বরজিৎ বললেন, “দাদা, সাতশো বছর ওদের সঙ্গে আমরা বাস করছি। বলতে পারেন কবে ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিয়েছে ?”
মোগল যুগেও ছিল চাপানো শান্তি কবরের শান্তি। ব্রিটিশ যুগেও তাই। স্বাধীনতার পরে যা দেখছি তা নতুন কিছু নয়। নতুন বলতে এই পর্যন্ত যে, আমাদের হাতে একটা সৈন্তদল এসেছে। ছোট ছেলের হাতে ছুরি পড়লে যা হয়। সব জিনিস ছুরি দিয়ে কাটে। আমরাও সব জিনিস সৈন্ত দিয়ে সমাধান করতে চাই। ট্রাম-বাস পোড়াচ্ছে, পাঠাও সৈন্ত। রেল লাইন সরিয়েছে, পাঠাও সৈন্ত, ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গেছে, পাঠাও সৈন্ত। ফসল কাটবার লোক নেই, পাঠাও সৈন্ত। এর পরে নির্বাচনের সময় সৈন্ত পাঠাতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্তাও সৈন্তরাই মেটাতে, আমাদের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। বাধাও যুদ্ধ।”

জয়ন্ত চূপচাপ বসে সিগারেট টানছিলেন। অবশ্য দাদার অহুমতি নিয়ে। বললেন, “যুদ্ধের প্রয়োজন থাকলে যুদ্ধ বাধবেই। রাজারা যুদ্ধের দায়িত্ব না নিলে প্রজারা নেবে। আপনি কি বলতে চান যুদ্ধের প্রয়োজন নেই ?”

প্রত্যয়

স্বরজিৎ বললেন, “আছে বৈকি। তবে সাতশো বছর যখন সহ্য করেছি তখন আরো কয়েক বছর সহ্য করে দেখি। ধৈর্য আমাদের অসাধারণ। নইলে পাঁচশো বছর কেউ মুসলমানের অধীনে, দু’শো বছর কেউ ইংরেজের অধীনে কাটায়?”

দাদা বললেন, “কিন্তু আমার আসল কথা তা নয়। আমি যা চাই তা শান্তি, সত্যিকারের শান্তি। যুদ্ধের পথ দিয়ে কেউ কি কখনো শান্তির কুটীরে পৌঁছেছে? যাকে ওরা শান্তি বলে সেটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি। তেমন শান্তি আমি চাইনে। তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো। যা হবার তা হয়ে যাক, চুকে যাক। খতম হোক, সাবাড় হোক।”

নেপালদা সাহা দিয়ে বললেন, “আমিও তাই বলি। হয় হিন্দু সাবাড় হয়ে যাক, নয় মুসলমান সাবাড় হোক। সেইজন্তে বলি এখান থেকে মুসলমানদের বোঁটিয়ে বিদায় করে দাও। ওখান থেকে হিন্দুদের নিংড়ে বের করে নিয়ে এসো। ওজুটো জাত একসঙ্গে থাকতে পারবে না। লোকবিনিময় হচ্ছে একমাত্র সমাধান। তাতে যুদ্ধের ঝামেলা নেই। কারো গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। তারপরে শান্তি, চিরস্থায়ী শান্তি। যে যার নিজের ঘরে আরামে বাস করবে। এখানে হিন্দু, ওখানে মুসলমান।”

দাদা বললেন, “সেও তো সমস্তাকে ফাঁকি দেওয়া। তাতে সমস্যার স্বাদ নেই। অতএব সত্যিকারের শান্তি নেই। একদিন ওদের শক্তি বৃদ্ধি হলে ওরা এসে আমাদের ঘরে হানা দেবে। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হলে আমরাও ওদের ঘরে চড়াও হব। তৃতীয় পক্ষ কোন দিক থেকে

প্রত্যয়

ছুটে আসবে গরুড়ের মতো। গজকচ্ছপ দুটোকেই গ্রাস করবে পরম আনন্দে।”

স্বরজিৎ বললেন, “তা ছাড়া লোকবিনিময় তো মুখের কথায় হবে না। তার জন্তে অনিচ্ছুকের উপর চাপ দেওয়া দরকার। চাপ দিতে গেলে মারামারি বেধে যাবে। কে তার দায়িত্ব নেবে?”

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জয়ন্ত বললেন, “কেউ যদি না নেয়, জনত” নেবে।”

“তার মানে অরাজকতা।” স্বরজিৎ বললেন, “কোনো রাষ্ট্রই তা বরদাস্ত করতে পারে না। তা যদি চাও তো আগে রাষ্ট্র ভেঙে দাও! যে ডালে বসেছ সেই ডাল কাটো।”

নেপালদা বললেন, “ওটা কোনো কাজের কথা নয়। আমরা রাষ্ট্র ভাঙতে চাইনে, নিরাপদ হতে চাই। কী ক’রে তা হবে, যদি লোক-বিনিময় না হয়?”

“লোকবিনিময় যদি আপনা আপনি হয় আমার আপত্তি নেই কিন্তু চাপ দিতে গেলে মারামারি বাধবে। রাষ্ট্র বরদাস্ত করবে না।” স্বরজিৎ বললেন।

“লোক বিনিময় যদি আপনা আপনি হয়,” দাদা বললেন, “তা হলেও আমার আপত্তি। ওটা সমস্তার সমাধান নয়, সমস্তার থেকে পলায়ন। ওতে সমস্বয়ের স্বাদ নেই! বরং আরো দশ বকম ফ্যাসাদ। পূর্ববঙ্গের অর্ধেক হিন্দু যদি চলে আসে বাকী অর্ধেক আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক মুসলমান যদি চলে যায়, বাকী অর্ধেক আমাদের

প্রত্যয়

উপর আস্থা রেখে নিশ্চিত হতে পারবে না। সংখ্যালঘুকে বিলুপ্ত করে বা উদ্বিগ্ন করে কি সংখ্যালঘু সমস্য়ার সমাধান হয়? ও পথে শান্তি নেই সম্ভাব নেই। অস্ত্র পস্থা চাই।”

জয়ন্ত বললেন “দাদা, আপনি দেখছি শান্তির কাঙাল। ওটা আপনার বয়সের লক্ষণ। আমি কিন্তু অশান্তিকে ভয় করিনে, আমার কাছে শান্তির কোনো দাম নেই, যা কিছু দাম আত্মরক্ষার। বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে?”

দাদা বললেন, “কেন, ওরাও কি বাঙালী নয়? বাঙালী বলতে কি শুধু হিন্দু বোঝায়? মুসলমান বোঝায় না? খ্রিস্টিয়ান বোঝায় না?”

“বোঝায় বৈকি। কিন্তু দেখছেন না ওরা পূর্ববঙ্গের নাম রেখেছে পূর্বপাকিস্তান। ওরা এককালে বাঙালী ছিল। এখন পূর্ব পাকিস্তানী।”

“হাঁ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বারা বাস করে সে সব মুসলমান তো বাঙালী। না তাদেরও তুমি পূর্ব পাকিস্তানী বলতে চাও?”

“ওরা তো পাকিস্তানে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে। সামান্য একটু ঠেলা দিলেই দৌড় দেবে। ওরা বর্গচোরা আম। প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানী।”

দাদা বললেন, “তা হলে বাঙালীর সংখ্যা কমিয়ে এনে তুমি আড়াই কোটিতে দাঁড় করালে। বাকী তিন কোটি বাঙালীকে বানালে অবাঙালী। পূর্বপুরুষের বর্জনশীল মনোভাব একদা হিন্দু থেকে

প্রত্যয়

মুসলমান সৃষ্টি করেছিল। আজ বাঙালী থেকে অবাঙালী সৃষ্টি করছে সেই একই মনোভাব। বৃথা দোষ দিচ্ছ ওদের।”

নেপালদা বললেন, “ওরা তো বাংলা ভাষার অনেক কিছু বাদ দিচ্ছে, তার সঙ্গে অনেক কিছু জোড়া দিচ্ছে। ফলে যা হয়ে উঠেছে তা বাংলা কি আরবী বোঝা যায় না। বোধ হয় পূরবী উর্হু। দাদা, আপনি ওদের বাঙালী বলে গণ্য করলে কী হবে, ওদের গাঁটছড়া বাঁধা দিক্‌ প্রদেশের সঙ্গে।”

“সেটাও তো মহাভারতের অঙ্গ। ওরা যদি সিদ্ধুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে আর আমরা যদি ওদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধি, তা হলে মহাভারতেরই গ্রন্থি বন্ধন হয়। তার জন্তে দুঃখ করিনে। দুঃখ এই জন্তে যে, কেউ কাউকে বাঁচতে দেবে না, জালিয়ে মারবে। অথচ এমন করে পরস্পরকে জ্বালাতন করার কী প্রয়োজন ছিল বলতে পারো? হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে কি দেশটা যথেষ্ট বৃহৎ, যথেষ্ট ধনসম্পন্ন নয়? আমরা কি পরস্পরকে অংশ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম না? তাড়িয়ে দেওয়ার বেরে ফেলার মতো দীনতা আমাদের হলো কবে ও হলো কেন?”

দাদা কখন এক সময় উঠে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন। তাঁর এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, ঘরে আর এক জন মানুষ ছিল। হঠাৎ লক্ষ করে বললেন, “এই যে বিহু! তুমি কিছু বলছ না যে। তোমার কথাও শোনা যাক।”

বিহু বলল, “দাদা, আমি জীবনে কখনো এমন অসহায় বোধ করিনি। আমার দেশ নেই, দেশ ভেঙে গেছে। আমার জাতি নেই,

প্রত্যয়

জাতি ভেঙে যাচ্ছে। আমার ভাষা নেই, ভাষায় ভাঙন ধরেছে আমার সাহিত্য নেই, সাহিত্যেও ভেদবুদ্ধি। থাকার মধ্যে আছে ধর্ম। সে ধর্মও নিত্য অধর্মের ভাগী হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল আবার পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটেবে। সে ধারণা অন্তত দশ বছর পেছিয়ে গেল সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার দরুন। পাকিস্তান কেবল ওদের সৃষ্টি নয়, আমাদেরও সৃষ্টি। আমরাই তাকে আরো দশ বছর কায়ম করলুম। মুখের মতো ভাবছি লাড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। সে ক্ষমতা আমাদের নেই। পাগলের মতো বকছি লোকবিনিময় চাই। এখানে এক কোটি আশ্রয়প্রার্থী, ওখানে এক কোটি আশ্রয়প্রার্থী ভিড় করলে কুবেরের ভাণ্ডার ক্ষয় হয়। আমাদের ভাণ্ডারে এমন কী আছে, ওদের ভাণ্ডারেই বা আছে কী, যে, দুকোটি লোকের জীবনধারণের স্রব্যবস্থা হয়। মাঝখান থেকে নষ্ট হতে বসেছে চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য।”

নেপালদা বললেন, “সেটা গবর্নমেন্টের ক্রটি। আসছে বারের নির্বাচনে আমরা সে ক্রটি সারাব।”

বিনু বলল, “কোনো গবর্নমেন্ট পারবে না এ বোঝা বহিতে। উর্টের পিঠে শেষ কুটোর মতো এ বোঝা এক দিন অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে দেবে। বিপ্লবকে খাল কেটে ডেকে আনছে এ সমস্যা। এ নিয়ে যারা খেলা করছে তারা জানে না যে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে।”

দাদা বললেন অভিভূত হয়ে, “কিন্তু উপায় কী আছে! সকলেই আমরা অসহায় হয়ে দেখছি দেশ চলেছে ভাসতে ভাসতে সর্বনাশের

প্রত্যয়

মোহানায়। যেন একটা প্লাবনের মুখে পড়েছে। বিপ্লব আর কাকে বলে! এই তো বিপ্লব।”

জয়ন্ত বললেন, “আমি কিন্তু ভয় পাব না কিছুতেই। আশুক না বিপ্লব।”

নেপালদা শিউরে উঠলেন, “আমার দোকানের জগ্রে মজবুত দেখে এক জোড়া তাল কিনতে হবে। কোন দিন কী হয় বলা যায় না।”

“তা হলে চিড়িয়াখানার দ্বার খুলে যাবে দাদা?” স্বরজিৎ প্রশ্ন করলেন।

“কে জানে ভাই। আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড়। এমন স্বাধীনতা কে চেয়েছিল! কোথায় স্ভাষ? বেঁচে থাকলে ওর আশা উচিত ছিল এখন।” দাদা বললেন, “ও যদি আসত তা হলে এ সমগ্র দু’দিনে মিটে যেত।”

“আমিও তাই ভাবি।” বললেন নেপালদা, “ওকেই ভোট দিই।”

বিহু বলল, “অত সহজে মিটত না, দাদা। স্ভাষ এলেও মিটত না। যেসব নির্মম নিষ্ঠুর ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, তার জগ্রে অনুতাপ করতে হবে দুই পক্ষের লোককে। যেখানে অনুতাপ নেই সেখানে আশাভরসা নেই। আপনি কি কোথাও এতটুকু অনুতাপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?”

“না, তার চিহ্ন নেই।”

“এর চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল ১৯৭৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে। তার জগ্রে আজপর্যন্ত কেউ অনুতাপ করল না।

প্রত্যয়

আমাকে অবাক করেছে আমার দেশের এই নৃশংস মনোভাব। এ দেশ তো আমার চেনা দেশ নয়।”

“সেইজন্তেই তো বলছি চিড়িয়াখানা,” দাদা আর্দ্র স্বরে বললেন।

বিনু বলল, “আমার লক্ষ্য আর কিছুর উপরে নয়। আমি আমার দেশের নাড়ীতে হাত রেখে বসে আছি। দেখছি সে অহুতাপ করছে কি না। অহুতাপ তাকে করতেই হবে যদি সে বাঁচতে চায়। কিন্তু কবে তা জানিনে। দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প প্রাবন এক এক করে সব রকম দুর্যোগ আসছে! কাঁদতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কার জন্তে কাঁদব! যে পাপ করেও পাপের জন্তে অহুতাপ করল না তার জন্তে কাঁদব! না, কাঁদব না। তাকে সাজা পেতে হবে।”

নেপালদা বললেন, “ওটা তোমার বাড়াবাড়ি। কে পাপ করেছে, কবে পাপ করেছে, তার জন্তে অহুতাপ করতে হবে দেশশুদ্ধ মানুষকে? নইলে সাজা?”

জয়ন্ত বললেন, “কিসের পাপ? আজকের ভগতে পাপ বলে কিছু নেই। আগবিক বোমা ফেলে যারা লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশু হত্যা করল তারাই এখন জাতিসংঘের মোড়ল। তাদের কাছে দরবার না করলে আমরা কাশ্মীর রাখতে পারব না। কোথায় তোমার পাপ? কার জন্তে অহুতাপ করব?”

বিনু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। তার পর বলল, “দাদা, আজ উঠি।”

“উঠবে? আচ্ছা, আর এক দিন এসো। মতের সঙ্গে মত মেলে না,

প্রত্যয়

তা হলেও দুটো কথা বলে প্রাণটা জুড়ায়।” দাদাও উঠলেন তাকে এগিয়ে দিতে। আশ্চর্যতভাবে বললেন, “৩০শে জাভুয়ারী আমরা আমাদের বিবেক বলি দিয়েছি। বিবেকহীন সমাধান তো সমাধান নয়। আগে বিবেক ফিরে পাই, তার পরে সমাধান খুঁজে পাব।’

বিনু বলল, “তথাস্তু।”

স্বরজিৎ বললেন, “আমিও চলি। অন্তর অন্বেষণ করতে হবে। বাইরে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি। দাদা, নমস্কার। নমস্কার, নেপালদা। জয়ন্ত, নমস্কার। চলো বিনু।”

(১৯৫০)



পনেরোই অগাস্ট

এবারকার স্বাধীনতা দিবসে তেমন কোনো উদ্‌যাদনা দেখা গেল না ; উদ্‌যাদনা দূরের কথা, সহজ আনন্দ সাধারণ আহ্লাদ তাও যেন অদৃশ্য হয়েছে। এই নিয়ে আলোচনা চলছিল চার বন্ধুতে।

পত্নবীশ বলছিলেন, “আমেরিকা স্বাধীন হয় ষোনে ছুঁশো বছর আগে। সেদিনকার উদ্‌যাদনা এতদিনে শুকিয়ে মরে যাবার কথা। কিন্তু প্রতি বছর চৌঠা জুলাই তারিখে দেখা যায় সে মাদকতা তেমনি সরস, তেমনি ফেনিল। একটা দিনের জন্তে সারা দেশ উদ্‌দাম হয়ে ওঠে। আমাদের যেমন হোলিখেলার দিন তাদের তেমনি স্বাধীনতার দিন। ফরাসীদের দেশে বিপ্লব আরম্ভ হয় দেড়শো বছর আগে। এখনো তার স্মৃতি তেমনি সবুজ। প্রতি বছর চৌদ্দই জুলাই তারিখে প্যারিসের রাস্তাঘাটে নাচ গান হুল্লার অবধি থাকে না। তুমি যদি সেখানে যাও তোমাকে নিয়ে নাচবে ওদের তরুণীরা। আমাদের যেমন রাসলীলা তাদের তেমনি বিপ্লবের প্রথম দিবা,”

সিতাংশু বললেন, “সেই জন্তেই তো আমরা বিপ্লব চাই। রাসলীলা।”

পত্নবীশ বললেন, “তার সঙ্গে তুলনা করো আমাদের পনেরোই অগাস্টের। তিন বছর যেতে না যেতে বানের জল নেমে গেছে। নদীর বৃক্ক মস্ত চড়া। মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে দেশ। তিন বছর যদি বেঁচে থাকি হয়তো দেখব পনেরোই অগাস্ট লোকে শোকসভা করছে।”

প্রত্যয়

বিমলেন্দু বললেন, “ওটা তোমার বাড়াবাড়ি। এটা একটা দুর্বৎসর বলেই কারো মনে উৎসাহ নেই। এমন দুর্বৎসর কি আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায়নি?”

পত্নবীশ বললেন, “সে জ্ঞে নয়। লোকে ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, স্বাধীনতা যতটুকু সত্য, অঙ্গহানি তাকে চেয়ে অনেক বেশী সত্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে এর জ্ঞে তারা সুখী, কিন্তু দেশ অঙ্গহীন হয়েছে তার জ্ঞে তাদের অসুখের অন্ত নেই। সত্য কথা একজনকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বারো বছর পরে। সে মুক্তির প্রথম দিনে আনন্দ করছে। কিন্তু যতই দিন যাবে ততই তার ব্যথাবোধ প্রবল হবে এইজ্ঞে যে বেচারার একখানা হাত কেটে রাখা হয়েছে।”

স্বয়ম্ভু বললেন, “আমার মনে হয়, তা নয়। বিয়ের রাতের রোমাঞ্চ কি বিয়ের তিন বছর পরে কেউ আশা করে? তখন হয়তো দেখবে একঘেয়ে লাগছে। স্বাধীনতা দিবসে জোর করে আনন্দ করতে হবে। এটা প্রাণহীন একটা প্রথা। তার চেয়ে চুপ করে চিন্তা করা ভালো এই তিন বছর আমরা স্বাধীন মানুষের মতো ব্যবহার করেছি না উচ্ছৃঙ্খল বর্বরের মতো। লোকের স্বাধীনতা জিনিসটা বিনা সর্তে পাওয়া গেছে, বিনা সর্তে ভোগ দখল করা যাবে। সেটা ভুল। ওর একটা অনিখিত সর্ত আছে।*

“কী সে সর্ত?” প্রশ্ন করলেন পত্নবীশ।

“সর্তটা হচ্ছে এই যে, সৎসরে একটা দিন হৈ হলোড় করতে পারো, কিন্তু বাকী তিনশো চৌষটি দিন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। যারা

প্রত্যয়

বারো মাস উত্তেজনার নেশায় নাচছে তাদের দম থাকলে তো তারা পনেরোই অগাস্ট উৎসব করবে। এ রকম যদি চলতে থাকে তা হলে তিন বছর পরে শোকসভা করতে হবে হয়তো। করতে হবে স্বাধীনতা হারানোর জন্তে।”

“তা হলে তো আপদ যায়।” দিতাংশু বললেন, “এ আত্মদী রুটা হৈ।”

“না, না। এতদূর আমি যাব না। এ আত্মদী সাক্ষা,” পত্র-নবীশ বললেন। “কিন্তু এ অন্ধহানি আমি সহিতে পারছি নে। দিন দিন অসহনীয় হচ্ছে।”

“তোমার একার নয়, ভাই। আমাদের সকলের!” বিমলেন্দু বললেন।

“আমার ভাই যখন জাপান যায়,” স্বয়ম্ভু বলতে লাগলেন, “তখন লক্ষ করে ডিসিপ্লিন জিনিসটা জাপানীদের মজাগত। অথচ চীনাদের তা নয়। সেইজন্তে জাপানীরা সংখ্যান্ন হয়েও যুদ্ধে জিতছিল, চীনারা সংখ্যাধিক হয়েও হারছিল। আমাদের ইতিহাসেও এর বহুতর প্রমাণ আছে। মুষ্টিমেয় মুসলমান যে পাঁচশো বছর হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করতে পারল তার মূলে তাদের সহজাত ডিসিপ্লিন। ইংরেজদের তো আঙুলে গোনা যায়। দু’শো বছর তারা হিন্দু-মুসলমানের উপর রাজত্ব করে গেল। তার মূলেও সেই ডিসিপ্লিন। ইংরেজের ডিসিপ্লিন মুসলমানকেও লজ্জা দেয়। হিন্দুকে তো দেয়ই।”

প্রত্যয়

পত্নবীশ কী বলতে যাচ্ছিলেন, বিমলেন্দু বললেন, “আঃ। বলতে দাও।”

“আমরা যে অবশেষে স্বাধীন হয়েছি এও সেই ডিসিপ্লিনের পুণ্য-বলে।” বলে চললেন স্বয়ম্ভু। “মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যখন আটটি প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের মধুচক্র থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ায় কংগ্রেস, তখন বড়গাট লিনলিথগো ভেবেছিলেন মোমাছি ক’দিন চাক ছেড়ে থাকবে। আইন-সভার সদস্যদের মাইনে বন্ধ করে দিয়ে মনে করলেন এবার তো ফিরে যেতেই হবে। কিন্তু এক বছর গেল, দু’বছর গেল, আড়াই বছর গত হতে চলল। সবাই তখন জেলে। ক্রিপস্ এলেন দৌত্য করতে। জেলখানার দ্বার খুলে গেল। কিন্তু মধুচক্রে ফিরে গেল না কংগ্রেস। ফিরে গেল জেলখানায়, তার আগে জালিয়ে গেল দাবানল। কোটি কোটি টাকার প্রলোভন স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করল। কেটে গেল আরো তিন-চার বছর। কোন দেশের ইতিহাসে কোন পার্টি ক্ষমতা হাতে পেয়েও মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে সাত বছর অজ্ঞাত-বাস বরণ করেছে?”

“সে কংগ্রেস আর নেই।” আক্ষেপ করলেন বিমলেন্দু। “সে ডিসিপ্লিন আর নেই। সে ত্যাগস্পৃহা আর নেই। যে দীপ নিবে গেছে সে আর জ্বলবে না।”

“তার জন্তে আফসোস করে কী হবে।” স্বয়ম্ভু বললেন, “ডিসিপ্লিন যদি আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গ হয়ে থাকে তা হলে একদিন কংগ্রেসকে দিয়ে যার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তেমনি আর কাউকে দিয়ে

প্রত্যয়

তার প্রমাণ দেওয়া যাবে। নদীর জল চিরদিন একই খাতে প্রবাহিত হয় না। খাতের জন্তে দুঃখ করব না। দুঃখ করব নদীর জন্তে, যদি দেখি প্লাবনের আতিশয্যে প্রবাহ শুকিয়ে এসেছে।”

“তাই কি!” আত্মগতভাবে অশ্রুট স্বরে বললেন বিমলেন্দু।

“আমার ভয় হয়, তাই। উচ্ছৃঙ্খলতাকে কঠোর হস্তে দমন না করলে আমাদের স্বাধীনতার পরমাণু বেশী দিন নয়। পাকিস্তানের কী আসে যায়? স্বাধীনতার জন্তে সে তো ষাট বছর ধরে সাধনা করেনি। তার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিযোগিতায় নেমে আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা হারাই আর সেও যদি হারায় তার স্বাধীনতা তা হলে আমাদের ষাট বছরের সাধনা ব্যর্থ। তার তেমন কোনো ব্যর্থতা নেই।”

এ কথা শুনে সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তার পরে পত্নবীণা ধীরে ধীরে মুখ খুললেন। “তুমি কি বলতে চাও আমাদের এ স্বাধীনতা পাকা নয়?”

“না, পাকা নয়। পাকা হবে যদি একে আমরা সংঘের বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি। কিন্তু লক্ষণ ভালো নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে পাক্সা দিয়ে এক দল লোক চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছে, অথচ তাদের নিন্দা করার মতো সংসাহস আমাদের কারুর নেই। দেখে শুনে মনে হয়, আমরা রাজধর্ম পালন করার অযোগ্য। রাজা হবার সখ বোলো আনা, অথচ অপ্রিয় হবার ভয়ও আঠারো আনা। যেই মুখ ফুটে কিছু বলতে যাই আমরা পঁচজনে তেড়ে আসে। বলে, পাকিস্তানের পাণ্টা দিতে হবে। তা যদি আমরা না করি, তবে আমরা রাজ্য রাখতে

প্রত্যয়

পারব না। আমরা ক্লীব। এখন এই অমায়ুষদের সঙ্গে তর্ক করব কী ? এরা যে এদের স্বাধীনতা আজ থেকেই হারিয়ে বসে আছে। ঘটনা ছ'দশ বছর পরে ঘটে, তার কারণ ঘটে ছ'দশ বছর আগে। এদের চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারি এরা স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান মনে করে প্রতিহিংসাকে। কেউ আপত্তি করলে বলে ক্লীব।”

পত্রনবীশ বললেন, “পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে কেউ কি চায় ? তবে সহ্য করারও একটা সীমা আছে। কিছু যদি না করি তা হলে ঘটনার স্রোত আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।”

স্বয়ম্ভু বললেন, “যারা তাকে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে দেয় তারা এমন একটা শক্তিকে ডেকে আনে যে শক্তি তাকে আয়ত্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইংরেজ বা মার্কিন বা আর কেউ একদিন এসে হাজির হবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে। মাঝখান থেকে কাটা পড়বে স্বাধীনতা। বুথা হবে ষাট বছরের সাধনা।”

সিতাংশু বললেন, “তখন বিপ্লব ঘটবে।”

“পাগল।” স্বয়ম্ভু অস্থির হয়ে বললেন। “বিপ্লবের ডিসিপ্লিন এর চেয়েও কঠিন। বিপ্লবী শাসনতন্ত্র কোনো রকম উচ্ছৃঙ্খলতা এক দিনের জন্তেও বরদাস্ত করে না। সে তার সমস্ত শক্তি সংহত করে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে শেষ বার কুস্তি লড়তে। তুমি কি মনে করো কমিউনিস্টদের হাতে শাসনভার পড়লে তারা হিন্দু-মুসলমানের হিংসা-প্রতিহিংসা চব্বিশ ঘণ্টা চলতে দেবে ? কখনো না।”

আলোচনা যে লাইনে চলছিল সেটা বিমলেন্দুর পছন্দ হচ্ছিল না।

প্রত্যয়

তিনি বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। বিহুর আসার কথা ছিল। ততক্ষণ আসর জমানোর আগে তিনি বললেন, “হাঁ, ডিসিপ্লিন বড় ভালো জিনিস। পান্টাপাণ্টির প্রশ্ন তুলে যারা ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করতে উৎসাহ দেয় তারা স্বাধীনতার সর্ব ভঙ্গ করে। আমি কিন্তু ভাবছিলাম অস্ত্র কথা। যেখানে যাই সেখানে দেখি সকলের মুখ অন্ধকার। যার সঙ্গে কথা হয় সেই বলে, কোথাও কিছু একটা বিগড়েছে। এই যে এতক্ষণ ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে লেকচার শোনা গেল এও সেই বিগড়ানোর খবর। কিন্তু সারা ভারতের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি। তবে কেন সারা ভারতের সর্বত্র অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার ছায়া? তাই বলছিলাম এটা দুর্বৎসর। আমাদের গ্রহের দোষ।”

এমন সময় বিষ্ণু এসে পড়ল। বিমলেন্দু তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, “প্রকৃতি দেবীও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। অস্ত্রে পরে কা কথা!”

এই নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর বিমলেন্দু বললেন, “তোমরা তো যার যা বলবার তা বলেছ। এখন বিহুর বক্তব্য শোনা যাক। এবারকার স্বাধীনতা দিবসে তেমন কোনো উদ্গাদনা দেখা গেল না কেন, বলতে পারো, বিহু?”

বিহু বলল, “এ প্রশ্ন এই প্রথম শুনছি। যেখানে যাই সেখানে শুনি ওই একই জিজ্ঞাসা।”

“এখন তোমার কী উত্তর?”

“আমার উত্তর”, বিহু বলল, “তোমাদের অজানা নয়। কত বার

প্রত্যয়

ও কথা বলব? ত্রিশ বছরের তপস্কার শেষভাগে তাপস যখন সিদ্ধির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে তখন যদি সিদ্ধির বদলে অপসিদ্ধি ঘটে তা হলে যা হয় আমাদের বেলা তাই হয়েছে। ক্লাইমাক্সের (climax) বদলে অ্যান্টি-ক্লাইমাক্স (anti-climax)। দেশ স্বাধীন হয়েছে কেউ অস্বীকার করবে না। যদি করে তো সেটা অভিমানের কথা। কিন্তু এর জন্তে গান্ধীর মতো নেতার ত্রিশ বছরব্যাপী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না। স্বাধীনতার সংগ্রামে যদি আর কেউ সেনাপতি হয়ে থাকতেন তা হলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো অসঙ্গতি ঘটত না। আমাদের প্রতিবেশী বর্মা সিংহল পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়েছে, তাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এমন অসঙ্গতি ঘটেনি। কেবল আমাদের বেলায় এ অসঙ্গতি। না, অসঙ্গতি বললে কম বলা হয়। অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে একটা ছেদ রেখা পড়েছে। তাল কেটে গেছে। স্মৃতি ছিঁড়ে গেছে। খেই হারিয়ে গেছে।”

বিহু আরো কয়েক রকম উপমা খুঁজছিল। বিমলেন্দু বললেন, “বুঝেছি।”

“বুঝলে তো। ব্যক্তির জীবনে এ রকম কিছু ঘটলে তার অস্থখ করে। মানসিক অস্থখ থেকে কায়িক অস্থখ। ত্রিশ বছর এক ভাবে চলছে, তার পরে হঠাৎ আরেক রকম। তাও বাইরের চাপে নয়। অবস্থা বিপর্যয়ে নয়। নিজের ভিতরে যে কামনা ছিল, যাকে এতদিন দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, সে এখন অশাসিত অব্যবহৃত। হঠাৎ মেনকার মুখ দেখে বিশ্বামিত্রের মনে যে ভাব এসেছিল সেটা বিশ্বামিত্রের ভিতরে

প্রত্যয়

স্বপ্ন ছিল। বিশ্বামিত্র স্বয়ং তা জানতেন না। জানতেন দেবরাজ ইন্দ্র। এ ক্ষেত্রে ব্যবসাদার ইংরেজ। তারা স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্তে তপস্যা চলছিল এ সে স্বাধীনতা নয়, সে স্বাধীনতাকে ইংরেজ ভয় করে বলেই এ স্বাধীনতাকে পাঠিয়েছে। এ স্বাধীনতা আমাদের লোভ দেখিয়েছে, লোভে পড়ে আমরা ভ্রষ্ট হয়েছি। যার জন্তে এতকাল তপস্যা করে এসেছি সে যে কোথায় মিলিয়ে গেছে তার পাত্তা নেই। আর যে তার সাক্ষাৎ পাব সে ভরসাও নেই। কে তার জগ্নে আরো ত্রিশ বছর তপস্যা করবে? যিনি করতেন তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে খাঁটি আছেন যে ছাঁচারজন তাঁদের কাজ হবে নিজেদের বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখা। কঠিন কাজ। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে পথ চলতে হবে। সাথীর উপর নির্ভর করলে হতাশ হতে হবে। দল গঠন করে কাজ নেই। বিশ্বাস গঠন করো।”

বিমলেন্দু বললেন, “বিভূ, সকলেই আমরা ত্যাগের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। গান্ধীবাদীরাও বাদ যান না। গান্ধীজী যেদিন শহীদ হলেন সেই দিনই একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। সেটা ত্যাগের যুগ। তারপর থেকে ত্যাগের আর কোনো নতুন দৃষ্টান্ত নেই, মহত্তর দৃষ্টান্ত নেই। যে আবহাওয়ায় আমরা বাস করছি সেটা ত্যাগের নয়, দলাদলির। গান্ধীবাদীরা দলাদলি থেকে সরে থাকতে চান, উত্তম। কিন্তু নতুন কোনো ত্যাগের দৃষ্টান্ত না দেখলে লোকে তাঁদের দিকে তাকাবে কেন? শুধু তাঁদের বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা দেখে ক’জন আকৃষ্ট হবে?”

বিভূ বলল, “আপাতত কাউকে আকর্ষণ না করাই ভালো। নীরবে

প্রত্যয়

নিজের কাজ করে যাওয়াই যথেষ্ট। ত্যাগের অনেক রকম অভিব্যক্তি আছে। কেউ যদি পরের জন্তে আর কিছু না করে, কেবল সূতো কাটে, সেও এক হিসাবে ত্যাগ করে। কেউ যদি পরের জন্তে হাল লাঙল ধরে চাষ করে, সেও এক হিসাবে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখায়। দেশে এখনো সেবাকর্মীর অভাব হয়নি, তাদের সংখ্যা আগের চেয়ে কম হলেও খুব কম নয়। অভাব ঘটেছে বজ্রকঠোর বিশ্বাসের। বিশ্বাস যাদের আছে তাদেরও বিশ্বাসের জোর তেমন নেই। সেইজন্তে আমি ত্যাগের চেয়ে বিশ্বাসের উপর ঝোঁক দিতে চাই।”

সিতাংশু বললেন, “বিহু, তুমি কি মনে করো গান্ধীবাদের কোনো ভবিষ্যৎ আছে? আমার তা মনে হয় না। বিশ্বাস এক্ষেত্রে অন্ধ-বিশ্বাস।”

বিহু বলল, “মার্ক্সের মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটল, তার পরে এলো রুশ বিপ্লব। সেই পঞ্চাশ বছর মার্ক্সবাদীদের কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। তাঁদের অনেকেই মার্ক্সের উপর খোদকারী করে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরেছিলেন। ভবিষ্যৎ নেই তাঁদেরই ধারা গান্ধীর উপর খোদকারী করছেন।”

সিতাংশু বললেন, “দেশ কি তা বলে পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করবে?”

বিহু বলল, “ব্যক্তির জীবনে পঞ্চাশ বছর খুব বেশী দিন। কিন্তু জাতির জীবনে এমন কী বেশী! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ইতিমধ্যে বিশ্বামিত্রের দল কী করতে চান করুন। অত্যাচার দলেরও কেরামত দেখা যাক। গান্ধীবাদীদের ডাক পড়বে সকলের শেষে। ততদিন

প্রত্যয়

তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। সংখ্যায় কিছু আসে যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী যেদিন আসেন সেদিন তিনি ছিলেন একক।”

সিতাংশু বললেন, “না, দেশ তত কাল অপেক্ষা করবে না। গান্ধী-বাদীদেব বাদ দিবেই ভাবতে হবে। এ যুগ তাদের যুগ নয়।”

“তা হলে যুগটা কাদের?” জিজ্ঞাসা করলেন বিমলেন্দু।

“যারা ভালো মানুষ তাদের নয়। যারা ডানপিটে তাদের। হুনিয়ার অন্ত্রান্ত্র দেশের দিকে চেয়ে দেখ। যেমন ডানপিটে ইক্স-মার্কিন দল, তেমনি ডানপিটে রুশ-চীন দল। এদেশেও তাদের জুড়ি আছে। দরদার হলেই তারা মারামারি কাডাকাড়ি বাধাবে। গান্ধীবাদীদের মানবে কে?” উত্তর দিলেন সিতাংশু।

“না, না, এ আমাদের আধ্যাত্মিক দেশ। এখানে ওসব হবে না।” বিমলেন্দু বললেন। “গান্ধী নেই, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন।”

“পনেরোই অগাস্ট তাঁর আবির্ভাব দিবস।” পত্রনবীশ বললেন।

“কিন্তু তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক দেশের নেতৃত্ব করতে দেয়ি করছেন কেন? এখন তো গান্ধীজী নেই।” বললেন সিতাংশু।

“গান্ধীজী নেই, কিন্তু তার ছায়া খুবজে দিল্লীর রাজপথে। লগ্ন এখনো অল্পকূল হয়নি। অন্ধকার যতই নিবিড় হবে ততই নিকট হয়ে আসবে তাঁর অভ্যুদয় ক্ষণ। আমরা আশা করছি তিনি এসে আমাদের অঙ্গহানি দূর করবেন।” পত্রনবীশ বললেন।

“তার মানে,” সিতাংশু স্তম্ভালেন, “পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ?”

“সেটা তোমাদের অঙ্গমানের উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো।”

প্রত্যয়

“বুঝেছি।” সিতাংশু বললেন, “কিন্তু তা হলে পাকিস্থানের দোস্ত ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে। তোমরা যদি এতে রাজী থাক আমরার রাজী। উপলক্ষ যাই হোক না কেন, ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে এক হাত লড়তে হবে। ওরাই তো প্রতিবিপ্লবের মূর্ত প্রতীক।”

পত্ননবীশ এর জগ্রে প্রস্তুত ছিলেন না। চুপ করলেন।

লেন্দু বললেন, “থাক, থাক, ওসব যুদ্ধ-বিগ্রহে কাজ নেই। আধ্যাত্মিক শক্তি যখন প্রবল হবে তখন বিনা যুদ্ধেই যুদ্ধের ফল হবে। মুনিঋষিরা অভিশাপ দিয়ে কাজ হাসিল করতেন। গান্ধীজী করতেন অনশন দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ করবেন যৌগিক প্রক্রিয়ায়।”

স্বয়ম্ভু বললেন, “তামাসা রাখ। ডিসিপ্লিন, কঠোর ডিসিপ্লিন ভিন্ন উদ্ধারের পথ নেই। প্রথমে ডিসিপ্লিন, তার পরে প্রয়োজন হলে সংগ্রাম।”

বিমলেন্দু হাসলেন। “তার মানে অস্বহীন ত্যাগ। কে আজ তার জগ্রে প্রস্তুত! দুঃখ তো আমার ওইখানে। ত্যাগের শেষ সীমায় পৌছে গেছি আমরা। সেইজগ্রে এমন অবসর, নিকটম, হতাশ।”

(১২৫০)

গান্ধীজন্ম

“যে যুগে আমরা বাস করছি,” বন্ধু বললেন, “সে যুগ শুরু হয়েছে স্বাধীনতার বহু পূর্বে। সারা হবে স্বাধীনতার অনেক পরে। স্বাধীনতা হচ্ছে মাঝখানকার একটা অধ্যায়।”

“কী মনে করে ও কথা বললে?” জিজ্ঞাসা করল বিষ্ণু।

“ইতিহাস পড়তে পড়তে মনে এলো ও কথা। ইংলণ্ডের শক্তির মূলে তার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার। আমেরিকার শক্তির মূলেও তাই। রাশিয়ার শক্তির মূলেও তাই। এদের প্রত্যেকের ইতিহাসে এক দিন না এক দিন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটেছে। আগে ইংলণ্ডের, তার পরে আমেরিকার, তার পরে রাশিয়ার। ইংলণ্ডের আঁচলে বাঁধা থাকলে আমেরিকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটত না, সেইজন্যে আমেরিকা ইংলণ্ডের আঁচল থেকে আপনাকে মুক্ত করল। জারের কবলে থাকলে রাশিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটত না, সেইজন্যে রাশিয়ার আঁচল থেকে জারের কবল থেকে উদ্ধার করল। ভারত যে আপনাকে ইংলণ্ডের নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটানো। এটা যদি ধনিকদের নেতৃত্বে ঘটে তো ভালোই, নয়তো শ্রমিকদের নেতৃত্বে ঘটবে। কিন্তু এটা ঘটবেই। এ যদি না ঘটে তবে আমাদের স্বাধীনতার কোনো মানে হয় না। স্বাধীনতা মানে প্রাচীন কালে ফিরে যাবার স্বাধীনতা নয়।”

প্রত্যয়

“তা তো নয়ই। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলতে ইংলও আমেরিকার তথা রাশিয়ায় যা বোঝায় তা তো যুদ্ধের জন্তে প্রস্তুতি। শিল্প-বাণিজ্যে যে যত বেশী অগ্রগণ্য যুদ্ধের জন্তে সে-ই তত বেশী প্রস্তুত। যুদ্ধ একদিন বাধবেই। বাধবে কি, বেধে গেছে। তখন ওরা পরস্পরকে ধ্বংস করতে করতে এমন এক জায়গায় পৌছবে যেখানে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কেন তা হলে আমরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দিকে পা বাড়াব?”

“পা বাড়াব কি, পা বাড়িয়ে রয়েছি। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন গত দুই মহাযুদ্ধের মরশুমে আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধকে তুমি এত ভয় কর কেন? যুদ্ধ চিরকাল থাকবে। যুদ্ধ এমন কিছু ধ্বংস করে না যার পুনর্গঠন নেই। মানুষও আবার জন্মায়।”

বিলু বলল, “যুদ্ধ চিরকাল ছিল, একথা মানি। কিন্তু যুদ্ধ চিরকাল থাকবে, এ আমি মানব না। যুদ্ধের পিছনে এমন কোনো শাস্ত্রত নিয়ম কাজ করছে না যার দরুণ যুদ্ধ চিরকাল বাধবেই। ধরো, সামনের মহাযুদ্ধে যদি আমেরিকা জয়ী হয় তা হলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস আর কোনো দেশের হবে না। অথবা যদি রাশিয়া জয়ী হয় তা হলে তার সঙ্গে যুদ্ধে নামবার আশ্পর্ষ্য আর কোনো দেশের হবে না। যুদ্ধ চিরকাল থাকবে, এটা একটা ভুল ধারণা। তবে ত্রায়ের জন্তে সংগ্রাম চিরকাল থাকবে।”

বিলু বললেন, “তুমি দেখবে সামনের মহাযুদ্ধও শেষ নয়। তার পরে আরও আছে। আমার তো মনে হয় না যে এই পরস্পরের কোনো

প্রত্যয়

আদি ছিল বা অন্ত আছে। মানুষ যতদিন ক্লান্ত থাকে তত দিন শাস্তির মন্ত্র আওড়ায়। ক্লান্তিমোচনের পর বলে, যুদ্ধং দেহি। ধ্বংস অবশ্যজ্ঞাবী, তা সে জানে। ধ্বংসের পরে আসে পুনর্গঠনের পালা। নূতন সৃষ্টি পুরাতন সৃষ্টিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এমনি করেই প্রগতি হয়। তুমি যদি যুদ্ধের বিরোধিতা কর তা হলে প্রগতির বিরোধিতাই করবে।”

“আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষের স্বভাব কোনো দিন বদলাবে না। আমরা যারা গান্ধীজীকে দেখেছি, চিনেছি, ভালোবেসেছি, তারা বিশ্বাস করি যে মানুষ মাত্রেরই এক দিন অন্তঃপরিবর্তন হবে। সে দিন হয়তো দশ বিশ বছরের মধ্যে নয়, হয়তো দু’চার শতকের মধ্যে নয়, মানুষের ইতিহাসে দু’চার শতক এমন কিছু বেশী সময় নয়। কিন্তু আসবেই একদিন। আসবে গান্ধীজীর মতো বহুজনের আত্মদানে। তাঁর মতো প্রেমিক ও শহীদ যদি লাখে লাখে উদয় হয় তা হলে সামনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর। তখন যে বহিঃ-পরিবর্তন হবে তা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপ্লব। সে প্রগতির তুলনায় তোমাদের এ প্রগতি নিস্প্রভ। আমরা সেই প্রগতির ধ্যান করি, যে প্রগতি মানুষকে আরো উচ্চ স্তরে তুলে দেবে। যা শুধু প্রগতি নয়, যা উর্ধ্বগতি।”

“প্রেমিক ও শহীদ লাখে লাখে উদয় হয় না, ভাই। হবেও না। লাখে লাখে দূরের কথা, হাজারে হাজারে নয়। এই ত্রিশ বছরে ত্রিশটিও দেখা গেল না। সামনের পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশটি দেখলে আশ্চর্য হবে। তুমি বাস্তববাদী নও বলেই এমন প্রগতির ধ্যান করছ। মানুষ

প্রত্যয়

চিরকাল যা করেছে চিরকাল তাই করবে, মারামারি হানাহানি সন্তোষ এগিয়ে যাবে, ধ্বংসস্তূপের উপর নবীন সৃষ্টি গড়ে তুলবে। আবার ভাঙবে, আবার গড়বে। এমনি করেই প্রগতির পরিচয় দেবে।”

বিহু বলল, “তুমি ইতিহাস পড়েছ, কিন্তু ইতিহাস তৈরি করনি। আমরা ইতিহাস তৈরি করব। যা কোনো দিন হয়নি তাই এক দিন আমাদের দ্বারা হবে।”

“রাজা অশোকও ভাবতেন ও কথা। তাঁর ভাবনা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হলো। পড়ে আছে গুটিকয়েক শিলালিপি। পণ্ডিত ঠিল্ল আর কেউ তার পাঠোদ্ধার করতে পারে না। গান্ধীজীর ভাবনা, তোমাদের ভাবনা এক দিন নিশ্চিহ্ন হবে। রেখে যাবে খানকয়েক পুঁথি, কেউ যা পড়বে না।”

“কে জানে, হয়তো তাই হবে।” বিহু বলল নিরাসক্তভাবে। “সব নির্ভর করছে অন্তঃপরিবর্তনের উপরে। গান্ধীজীর আমরণ সাধনার পরেও তোমার অন্তঃপরিবর্তন হয়নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেবল তোমার কেন, তাঁর যারা শ্রেষ্ঠ সহকর্মী তাঁদেরও হয়নি। আরো হাজার হাজার প্রেমিককে শহীদ হতে হবে এর জন্তে। যত দিন তারা তৈরি না হয়েছে ততদিন ইতিহাস তৈরি করব বললেই ইতিহাস তৈরি হবে না। ততদিন ইতিহাস তার জানা রাস্তায় চলবে। যুদ্ধ, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, ক্লান্তি, শাস্তি, পুনরায় যুদ্ধ ইত্যাদি।”

“কিন্তু অজানা রাস্তার যে কোনো ঐতিহাসিক নজির নেই। তোমরা যে আশা করছ তা আকাশকুসুম। সেই জন্তে অত সহজে

প্রত্যয়

হতাশ হচ্ছ। আমার মতো যদি ইতিহাস পড়তে তা হলে ইতিহাস তৈরি করার খেয়াল ছেড়ে দিয়ে জানা রাস্তায় চলতে। জানা রাস্তায় অভ্যর্থনা প্রেরণা নেই, কিন্তু এটা নির্ভরযোগ্য। এই যেমন আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হবেই। ধনিক নেতৃত্বে যদি না হয়, তবে শ্রমিক নেতৃত্ব হবে।”

“আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই। যে সব দেশে ধনিক নেতৃত্ব সে সব দেশে ডিপ্রেসন শুরু হয়ে গেছে। ডিপ্রেসন থেকে রক্ষা পাবার অন্য উপায় নেই দেখে তারা যুদ্ধের জগ্রে প্রস্তুত হচ্ছে। তাতে বহু বেকারকে কাজ দেবার সুবিধে। বহু বেকারকে বদল করারও সুবিধে। যে সব দেশে শ্রমিক নেতৃত্ব সে সব দেশে বেকার নেই, কিন্তু যারা বেকার হতে পারত তারা বেগার দিতে বাধ্য হয়। সেখানেও সেই যুদ্ধের জগ্রে প্রস্তুতি। আমাদের দেশে এখন ধনিক নেতৃত্ব। তাই ডিপ্রেসন। তাই বেকারকে কাজ দেবার জগ্রে যুদ্ধের প্রস্তুতি। যদি শ্রমিক নেতৃত্ব হয় তা হলে শ্রমিকদের অনেকে বেগার দেবে। চলতে থাকবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। দুটোর যে কোনো একটা পথে চলতে গেলে দেবে পথের শেষে যুদ্ধ। স্বতরাং ধ্বংস। গত দুই মহাযুদ্ধে ধ্বংসের ধাক্কা সামলাতে হয়নি বলে তোমরা শুধু ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। এবার ফাঁদও দেখবে। তখন তোমরাই তোমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঠেকাবে।”

“ধ্বংসকে তুমি এত ভয় কর কেন?” বন্ধু বললেন, “ধ্বংস যখন হবে তখন হবে। তার আগে দেশটা সমৃদ্ধ হোক, কলকারখানায় ছেয়ে যাক। মানুষগুলো অন্ধকার থেকে আলোকে আসুক। হয় মার্কিনের

প্রত্যয়

মতো, নয় ক্রুশের মতো জীবন্ত হোক। মরবে একদিন মহাযুদ্ধে, তা বলে জ্যাস্ত মানুষের মতো বাঁচবে না।”

“আমিও চাই যে তারা জ্যাস্ত মানুষের মতো বাঁচে।” বিনু বলল, “কিন্তু তারা কি বাঁচতে ও বাঁচাতে চায়! তারা চায় মারতে ও মরতে। নেশাখোর যেমন নেশা না হলে বাঁচে না, এরা তেমনি হিংসা না হলে বাঁচে না। এরা হিংসাখোর। এই হিংস্র প্রাণীদের নখদন্ত বিজ্ঞানের কল্যাণে অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাই দিয়ে এরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করবে, নির্বংশ করবে। এর ফলে প্রগতি হয়তো কিছু হবে। সমাজের গড়ন হয়তো কিছু বদলাবে। যারা পায়ের তলায় ছিল তারা হয়তো মাথার উপর চড়বে। কিন্তু অনেক মরে যাবে যে ক’জন অবশিষ্ট থাকবে তারা আর একটা যুদ্ধের আশঙ্কায় দিন গুণবে, যদি না এক পক্ষ সম্পূর্ণভাবে বিধ্বজ্যী হয়।”

“কী হবে না হবে তা এখন থেকে ভেবে কাজ নেই। শুধু এইটুকু ভাবলে চলবে যে আজকের দুনিয়ায় বাস করতে হলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ইংলণ্ড গেছে, আমেরিকা গেছে, রাশিয়া যাচ্ছে, চীন যাবে, ভারত যাবে। এর দরুন যদি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যেতে হবে ধ্বংসের ভিতর দিয়ে। বুকের পাটা শক্ত করতে হবে। তা নয়, কেবল গান্ধী গান্ধী বলে অরণ্যে বোদন ও মাছাতার আমলের চরকায় সূত্র কর্তন। এমন করে কি প্রগতি হয়?”

“বেশ তো। তোমাদের হাতে ক্ষমতা। তোমরা ইচ্ছা করলে দেশটাকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে, যুদ্ধের

প্রত্যয়

ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারো। তবে আমাদের নৈতিক সমর্থন আশা করো না। আমরা যদি দেখি যে তোমরা অপরের উপর বলপ্রয়োগ করছ না, অপরের সম্মতি পাচ্ছ, তা হলে কিছু বলব না। নয়তো প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদ একদিন প্রতিরোধে পরিণত হবে, যদি কনস্ক্রিপশন চালাতে যাও, যদি বেগার খাটাতে চেষ্টা কর। তখন হয়তো দেখবে শত শত প্রেমিক শহীদ হতে উত্তত। গান্ধীর রক্ত শুকিয়ে যায় নি। ভারতের মৃত্তিকাকে উর্বর করেছে। এ মাটিতে আরো অনেক প্রেমিক, আরো অনেক শহীদ জন্মাবে। শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছাই জয়ী হবে, তাদের ধ্যানই মূর্তি ধরবে। প্রথমে অস্তঃ-পরিবর্তন, তার পরে বহিঃপরিবর্তন।”

“অস্তঃপরিবর্তন” বন্ধু হাসলেন। “ওটা তোমাদেরই হওয়া উচিত। দেশটাকে তোমরা মধ্যযুগের ঘাটে বেঁধে রাখতে চাও। তাকে বর্তমান যুগের মাঝ দরিয়ায় ভাসতে দেবে না। প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধ করবে। কিন্তু গতিরোধ করতে পারবে কি? দেখা যাক, ক’জন গান্ধীবাদী বুকে গুলি খায়!”

“কুকুরকে বদনাম দিয়ে গাছে ফাঁসি দেবার প্রবাদ আছে। তেমনি গান্ধীবাদীদের মধ্যযুগীয় বলে বদনাম দিয়ে বিদায় করা হবে। কিন্তু আসলে তারা মধ্যযুগীয় নয়। তারাও এ যুগের লোক। মধ্যযুগে গান্ধীর মতো কেউ কোনো দেশে জন্মাননি। তখন হিংসা নামক নেশাটা জনগণের মধ্যে ছড়ায়নি। বড় বড় কলকারখানার জন্মে ছলে বলে কৌশলে অগণিত শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়নি। মধ্যযুগ নয়, বর্তমান

প্রত্যয়

যুগই গান্ধীজীর যুগ। এ যুগের ভাগ্যবিধাতারা যদি হিংসার নেশাটাকে সমাজের সর্ব স্তরে ছড়িয়ে না দিতেন তা হলে গান্ধীজন্মের প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজন হতো না তাঁর আবির্ভাবের, যদি অগণিত শ্রমিককে তাদের গ্রাম থেকে, তাদের ঘরবাড়ী থেকে, তাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনে, ছিনিয়ে এনে কলকারখানার আশেপাশে নজরবন্দী করা না হতো। তাদের অপর একটা জীবিকা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবিকাকে ধ্বংস করা হয়েছে যাতে তারা কলকারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হয়। হঠাৎ মনে হয় প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হলো, কিন্তু অগ্নায় উপায়ে ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিকূল না হলে প্রতিযোগিতায় ধ্বংস করা সহজ নয়। রাষ্ট্র অশুকূল হলে তো নয়ই। এ যুগের ভাগ্য-বিধাতারা নিজেদের দুষ্কৃতির দ্বারা ডেকে এনেছেন গান্ধীকে, যেমন কংস ডেকে এনেছিল রুক্ষকে। রাবণ ডেকে এনেছিল রামকে।”

“বাজে বকছ,” বন্ধু হেসে উড়িয়ে দিলেন। “কিন্তু মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া ভিন্ন তোমাদের আর কী করণীয় আছে?”

“আমরা মধ্যযুগের লোক হলে তো মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার কথা উঠবে? আমরা এই যুগেরই সন্তান। আমরাও এগিয়ে যেতে চাই, পেছিয়ে যেতে নয়। কিন্তু আমাদের অগ্রগতি অন্তঃপরিবর্তনের ভিতর দিয়ে শান্তির ভিতর দিয়ে। আমরা চাই যে-যার নিজের ঘরবাড়ীতে নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে থেকে কাজ করুক, একজনের কাজ আর এক জনের কাজের পরিপূরক হোক, একজন ছাতা তৈরি করুক, আর এক জন তৈরি করুক জুতো, আর এক জন মাছ ধরে নিয়ে আশুক, আর এক জন

প্রত্যয়

আমুক নিজের ক্ষেতের ধান, সকলে মিলে একটা সমাজ করুক, যে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তারা প্রত্যেকে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী, কেউ কারো প্রতিযোগী নয়। একজনের বা একটি গোষ্ঠীর লাভের অগ্রে উৎপাদন করা হবে না, উৎপাদন করা হবে সকলের প্রয়োজন মেটাতে। কেউ কোনো রকম উপস্থিত পাবে না, পাবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা প্রয়োজনীয় ভোজ্য ও ভোগ্য। যারা কায়িক শ্রমের চেয়ে মানসিক শ্রমে স্বভাবত পটু তারা মানসিক শ্রমের দ্বারা সহযোগিতা করবে। তারা বুদ্ধিমান বলে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে থাকবে, এটা চলবে না। যারা স্বভাবত সাহসী ও বলবান তারা আর পাঁচজনকে ভয় দেখিয়ে শাসন ও শোষণ করবে, এমনটি হতে দেওয়া হবে না। তারা আর পাঁচজনকে রক্ষা করবে, সেইভাবে সহযোগিতা করবে। যারা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করার কৌশল জানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বভাবসিদ্ধ, তারাও করবে সহযোগিতা। তারা আর পাঁচজনের পরিশ্রমের ফল দিয়ে নিজেদের ভাণ্ডার ভরাবে না। এমন যে সমাজ এর শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান আপনা হতেই হবে। পুলিশ লাগবে না। যদি লাগে তবে অল্পসংখ্যক। বাইরে থেকে একদিন আক্রমণ আসতে পারে এই আশঙ্কায় একটা সৈন্যদল খাড়া রাখতে হবে না। দরকার হলে স্বৈচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করে বিপদের সন্মুখীন হওয়া যাবে। নয়তো সত্যগ্রহ করা যাবে।”

“এ স্বপ্ন আজকের নয়।” বন্ধু হেসে বললেন, “আদিকাল থেকে যেখানে যত ইউটোপিয়ান জন্মেছে সকলে দেখেছে এই স্বপ্ন বা এর রকমফের। রুট বাস্তব তাদের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। কারণ মানুষকে তারা

প্রত্যয়

যতটা নিঃস্বার্থ মনে করেছে মানুষ ততটা নয়। নিজেদের নিঃস্বার্থতা দিয়ে তারা আর পাঁচজনের নিঃস্বার্থতার পরিমাপ করেছে। সেটা ভুল! গান্ধীজীর বেলাও সেই ভুল ঘটেছে। তবে একটা জায়গায় তিনি তাঁর পূর্বগামী স্বপ্নদ্রষ্টাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। সেটা সত্যগ্রহ বা সাদ্বিক প্রতিরোধ। তাকে আমরা সকলেই ভয় করি। এদেশ যদি আবার পরপদানত হয় তা হলে সত্যগ্রহীদের সাদ্বিক প্রতিরোধকে তারা ভয় করবে। ইতিহাসে এই একটা নতুন জিনিস দেখলুম। এই জন্তে গান্ধীজন্মের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অহিংস সমাজ! হায় বন্ধু, সে আশা ছুরাশা!”

“আমাদের আর কোনো ছুরাশা নেই, ঐ একটি ছুরাশাই আছে। মানুষ বাঁচে আশা নিয়ে। আমরাও বাঁচব। গান্ধীজী আমাদের মনে আশা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, উপায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁকে ভুলব না। তিনি যদি ভুল করে থাকেন তবু সেই ভুলও আমাদের পক্ষে শ্রেয়। তোমরা ঠিক করে যাও, আমরা ভুল করে যাই। তার পর ইতিহাস বিচার করবে কোন্ পথে প্রগতি।”

(১৯৫০)

জমি কার

ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গের জ্যোতদার। বাড়ীতে সাম্যবাদী ইস্তাহার পেয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বহু দুর্ভোগের পর তিনি মুক্ত হন। তার পরে কলকাতা চলে আসেন। বিহু তাঁর পুরাতন আলাপী। দেখা করতে এনেছেন বিহুর সঙ্গে।

বললেন, “ভারতবর্ষের মাটিতে কমিউনিজম গজাবে এ কখনো আমি বিশ্বাস করিনে। ইস্তাহার রেখেছিল আমার ছেলে। আজকালকার ছেলেদের উপর মা-বাপের এক্তার নেই। অকারণে ভুগতে হলো এ বয়সে আমাকে।”

বিহু তাঁকে সহানুভূতি জানাল। তার পরে বলল, “রুশদেশে সম্বন্ধে ভন্টয়েভস্কি ও কথা লিখেছিলেন। চীনদেশের বিদ্বানদেরও ধারণা ছিল অনুরূপ। তবু দেখা যাচ্ছে রুশ চীন লাল হয়ে গেছে। কখনোখানকার মাটিতে কী গজায় না গজায় সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জোর করে বলতে পারে না এ যুগে। নইলে আপনার ছেলে রাখে সাম্যবাদী ইস্তাহার!”

“তা হলে কি প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ বলে কিছু থাকবে না? রাষ্ট্র সব কিছু চালাবে? চালাতে চাইলে কি চলবে?”

“প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের কথা বলেছেন? বলুন দেখি, গত দেড়শো বছরে জমিদার কিম্বা তালুকদার কিম্বা জ্যোতদার জমিতে

প্রত্যয়

ক'টাকা ঢেলেছেন? জমি থেকে যত টাকা উঠিয়েছেন তার সিকির' প'কি জমির উন্নতির জন্য ব্যয় করেছেন কি?"

ভদ্রলোক বললেন, "না।"

"তা হলে দেখুন, জমিতে টাকা ঢালতে কেউ রাজী নয়। চাষীর টাকা থাকলে সে হয়তো টাকা ঢালত কিন্তু তার টাকা নেই। তা ছাড়া তার আশঙ্কা জমির খাজনা বৃদ্ধি হবে। কিম্বা জমি বেহাত হয়ে যাবে। সেই ভয়ে সে টাকা থাকলেও ঢালতে নারাজ। কী করে তা হলে আশা করেন যে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের উপর জমির ভার ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রনায়করা নিশ্চিন্ত হবেন? এই যে খাজনাকট ঘনিয়ে আসছে এটা যখন আর একটু ঘনাবে, যখন বাইরে থেকে খাজনা আমদানি বন্ধ হবে, তখন প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের উপর বরাত দিয়ে বসে থাকলে দেশের লোক না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তখন অধিকতর ফসল ফলাতে হলে জমিতে টাকা ঢালতে হবে। রাষ্ট্রই ঢালবে যে টাকা। সুতরাং রাষ্ট্রই হুকুম করবে কোন্ জমিতে কী চাষ করা হবে, কত ফসল ফলাতে হবে, রাষ্ট্রকে দিতে হবে কত, জমিদারের প্রাপ্য কত, চাষীর প্রাপ্য কত। এক বার রাষ্ট্র আসরে নামলে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের দফা রফা।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কি তার পক্ষপাতী?"

বিহু বলল, "না, আমি তার পক্ষপাতী নই। কিন্তু কেউ যদি টাকা না ঢালে তবে জমির উন্নতি হবে না, জমির উন্নতি না হলে ফসলের পরিমাণ বাড়বে না, ফসলের পরিমাণ না বাড়লে রেশনের পরিমাণ

প্রত্যয়

বাড়বে না, রেশন প্রথা উঠে যাওয়া তো দুব্বের কথা। কে টাকা ঢালবে? জমিদার? তালুকদার? খোতদার?”

“না।” ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে সে রকম মতিগতি তাঁদের নেই।

“চাষীর হাতে টাকা থাকলে তো সে ঢালবে। আর থাকলেও সে ঢালবে কেন, যদি জমির উপর তার স্বত্ত্ব আমেরিকার বা ফ্রান্সের মতো সর্বময় স্বত্ত্ব না হয়? তা হলে দাড়াচ্ছে রাষ্ট্রকেই টাকা ঢালতে হবে। যে টাকা ঢালবে সে স্বত্ত্ব আসলে উত্তল করবে। এই তো নিয়ম।”

ভদ্রলোক মেনে নিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন, “আর কোন বিকল্প নেই কি?”

“আছে। কিছু সেটা আপনার ভালো লাগবে না। সেটা শ্রুতিমধুর নয়।”

“তবু শুনি।”

“বিকল্প হচ্ছে, লাঙল বার জমি তার। তার উপরে বতগুলো স্বত্ত্ব আছে সব স্বত্ত্ব লোপ করা। এমন কি, রাষ্ট্র যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ আদায় করে তাও লোপ করতে হবে। ঠিক যেমন আমেরিকায় বা ফ্রান্সে।”

“আবার যে আড়াইশো বিঘা জমি আছে। আমি কোথায় দাঁড়াব?”

“আপনি সপরিবারে বতটা পাবেন চাষ করবেন। বাকীটার মমতা কাটাবেন। নয়তো আপনি রাজী হয়ে যান টাকা ঢালতে। জমির উন্নতি করতে। ফসলের পরিমাণ যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করতে।”

প্রত্যয়

তিনি মাথা নাড়লেন : “সে আমি পারব না।”

“পারবেন না তো।” বিহু হেসে বলল, “তা হলে যে পারবে সে-ই এক দিন জমির মালিক হবে। দেশের লোক খেতে না পেলে দেশের সরকার যত রকম উপায় আছে সব রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখবে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার মতো স্টেট ফার্ম বা কলেক্টিভ ফার্ম করবে। অথবা আমেরিকার মতো, ফ্রান্সের মতো চাষীকেই মালিক বলে ঘোষণা করবে। খেসারতের দাবি অবশ্য উঠবে। কিন্তু যে দলের হাতে গবর্নমেন্ট থাকবে সে দল খেসারৎ দিতে রাজী হবে কি না বলা যায় না, দিলেও কতটুকু দেবে তাও বলা যায় না। মোট কথা, চাষবাসের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করলে চাষীর জমির উন্নতির জন্তে টাকা ঢালবে না।”

ভদ্রলোক বললেন, “টাকা থাকলে তো টাকা ঢালবে। সাধারণ চাষীর হাতে টাকা জমে না।”

বিহু ভেবে বলল, “সেইজন্তে আমার আশঙ্কা হয় যে চাষীর হাতে জমি যাবে না, যাবে রাষ্ট্রের হাতে। তবে উত্তর প্রদেশের উদাহরণ দেখে আশাও হয় যে চাষীর হাতেই যাবে। চাষীরা যদি একজোট হয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করে তা হলে সকলে মিলে টাকা ঢালবে, সকলে মিলে শ্রম ঢালবে। সেই ভাবে জমির উন্নতি হবে, ফসলের পরিমাণ বাড়বে।”

“সমবায়!” ভদ্রলোক বললেন, “সমবায়ের যে নমুনা দেখা গেল এ দেশে তার পরে অতি বড় আশাবাদীরও আশা নেই ওর উপর।”

“ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে চাষবাসের আশ্চর্য উন্নতি দেখিয়েছে। তারা

প্রত্যয়

সংঘবদ্ধ হয়ে চাষ করে। যা উৎপন্ন হয় তা সকলে মিলে ভাগ করে নেয়। চেষ্টা করলে এ দেশেও সেটা সম্ভব।”

“এ দেশে,” ভদ্রলোক বিশ্বাস করলেন না, বললেন, “সম্ভব হবে না।”

“তা যদি সম্ভব না হয় তবে অগত্যা রাষ্ট্রকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। তখন রাষ্ট্রই চালাবে চাষবাস। যারা চাষ করবে তারা রাষ্ট্রের ফরমাসে করবে। নিজেদের মজিতে নয়। খাদ্যসঙ্কট দূর হতে পারে এই উপায়ে, রাশিয়া তার নজির।”

ভদ্রলোক বললেন, “কিন্তু সেটা কি ভালো হবে? উদ্যোগিতা বা পুরুষকার বলে কিছু থাকবে না? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম?”

“আমিও সে কথা বলে থাকি। কিন্তু সমাধান আর কী ভাবে হতে পারে, গোড়াতেই যদি আপনি ধরে নেন যে প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের মতো সংঘবদ্ধ চাষ এদেশে সম্ভব নয়? চাষীরা যদি সংঘবদ্ধ না হয় তা হলে তাদের হাত থেকে জমি ক্রমে রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবেই। আধপেটা খেয়ে এ দেশের লোক ক’দিন নাচবে, ক’দিন খাটবে? কী করে দেশের কাজকর্ম চলবে! খাদ্যসঙ্কট আর একটু তীব্র হলেই কথা উঠবে জমিতে হস্তক্ষেপ করার। অথবা চাষীকে সংঘবদ্ধ করার।”

“রাশিয়ার ইতিহাসে পড়েছি কলেকটিভ ফার্মের সূচনা কেমন করে হলো। আমার ছেলে আমাকে অনেক বই পড়তে দিয়েছে। তবু কমিউনিস্ট বানাতে পারেনি।”

প্রত্যয়

“কলেকটিভ ফার্ম ওরাও চায়নি। ওরাও চাষীকে জমি দিয়েছিল। কিন্তু খাণ্ডসঙ্কট যখন ভয়াবহ হলো তখন ওরা হস্তক্ষেপ করল।”

ভদ্রলোক বললেন, “হ্যাঁ, একটা কিছু করা দরকার। তবে কী করা দরকার তা মাথায় আসছে না। আমরা কি তবে ধ্বংসোন্মুখ?”

বিহু বলল, “সমাজের যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা করলে ধ্বংসোন্মুখ হবার ভয় থাকে না। এই খাণ্ডসঙ্কটে সমাজের যা প্রয়োজন তা প্রচুর এবং পুষ্টিকর খাদ্য। প্রতিদিন আমরা এর অভাব অনুভব করছি। বৃদ্ধদের অবস্থা খারাপ তারা তো একবেলা না খেয়ে আছে। আর এক বেলা আধপেটা খায়। তাও পুষ্টিকর নয়। এ সঙ্কট বেশী দূর গড়ালে গবর্নমেন্ট বদলাবে। হয়তো বিপ্লব ঘটবে। ফরাসী বিপ্লব বলুন, রুশ বিপ্লব বলুন, খাণ্ডসঙ্কটেই তার সূচনা। সূত্রাং সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে। প্রত্যেকটা উপায় পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে শেষ উপায় হচ্ছে চাষীর হাতে জমির সর্ব স্বত্ব সমর্পণ, তবে আপনাকে হাল লাঙল নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আর যদি সেরা উপায় হয় স্টেট ফার্ম বা কলেকটিভ ফার্ম তা হলে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের নামে জিভ কাটলে চলবে কেন?”

“তা বটে।” ভদ্রলোক শায় দিলেন।

এর পরে বিহু বলতে লাগল, “অবশ্য এই যথেষ্ট নয়। উৎপাদনের সমস্তা মিটলেও বিনিময়ের সমস্তা অত সহজে মিটবে না। চাষীর হাতেই যদি চাষের দায়িত্ব থাকে তবে সে যে টাকাটা ঢালবে সেটা স্বেচ্ছা আসলে আনায়ে করে নিতে চাইবে। কিন্তু সে তার উৎপন্ন শস্যের জগ্গে যে মূল্য

প্রত্যয়

প্রত্যাশা করবে সে মূল্য দিতে হয়তো কর্তারা কার্পণ্য করবেন। ইনফ্লেশনের ভয় আছে। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে কাপড় কেরোসিন ইত্যাদি যেসব জিনিস চায়ীদের দরকার সে সব জিনিস কম দামে তাদের জোগানো। কিন্তু কম দামে জোগানো দূরের কথা, পর্যাপ্ত পরিমাণে জোগানো সহজ নয়। এত কলকারখানা আমাদের নেই, বাইরে থেকে আমদানি করতে গেলে ডলারের অভাব। এসব জিনিস এক দিন বাধ্য হয়ে গ্রামে গ্রামে উৎপাদন করিয়ে নিতে হবে কুটীরশিল্পের দ্বারা। অবশ্য কেরোসিন নয়, করোগেট নয়। এ ছাড়া আমি আর কোনো হাঁয়সঙ্গত উপায় দেখিনি। চায়ীদের কাছ থেকে কম দামে ফসল কেড়ে নিয়ে আসা অথচ তাদের কম দামে কাপড় ইত্যাদি জোগাতে না পারা আমার বিবেচনায় হাঁয়সঙ্গত নয়। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের এটাও একটা কারণ। চায়ী রাগ করে খাদ্যশস্যের আবাদ কমিয়ে দিয়েছে, তার বদলে পাট তামাক লাগিয়েছে। তাতে বিনিময়ের সুবিধা।”

ভদ্রলোক বললেন, “এসব আমার জানা ছিল না। অনেক নতুন কথা শোনা গেল। আসব আর এক দিন।”

(১৯৫০)

হাতীর খোরাক

স্বশীতলের দিকে ফিরে অধ্যাপক বললেন, “ভায়া, অত অধীর হলে চলবে কেন ? এই ক’বছরে যে সব পরিবর্তন আমরা দেখেছি তা নিয়ে বড় একখানা ইতিহাস লেখা যায়। বিদেশী শাসন রহিত হলো, এ কি কম সময়সাপেক্ষ কাজ ! আর কেউ কি এ কাজ আরো কম সময়ে পারত ! বিখ্যাত একজন বামপন্থী নেতা বলেছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের একশো বছর পূর্ণ না হলে দেশ স্বাধীন হবে না। এখন শুনছি তার দশ বছর আগে স্বাধীন হতে গিয়ে বিভক্ত হয়েছে এবং সেটা একটা অপরাধ। হয়তো তাই। অসময়ে স্বাধীন হতে গেলে একটা না একটা বিভ্রাট ঘটে। যেমন নাবালকের বেলায় তেমনি নেশনের বেলায়। আমরা যে হিন্দু মুসলমান মিলে একটা আস্ত নেশন হইনি এটা এক কালে স্বীকার করতে বাধ্য ! এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। সেইজন্তে মনে হয় আরো দশ বছর সবুর করলে নেশন হিসাবে আমরা অথও হতুম, তার পরে স্বাধীন হতুম। সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে যা হবার তা হয়েছে। এ নিয়ে মন খারাপ করা মিছে।”

নেপলদা বললেন, “দশ বছর কেন, একশো বছর সবুর করলেও হিন্দু মুসলমান মিলে আস্ত একটা নেশন হতো না। যা হবার নয় তার জন্তে স্বাধীনতা পেছিয়ে যেত এটা অসম্ভব। সেইজন্তে আমরা দেশবিভাগে রাজি হয়েছি।”

প্রত্যয়

অধ্যাপক বললেন, “তা হলে দেখা যাচ্ছে দোষ ইংরেজের নয়। দোষ আমাদের। এর স্বযোগ নিয়ে ইংরেজ এত দিন রাজত্ব করে গেল। ভবিষ্যতে আর কেউ নেবে এর স্বযোগ, কেননা স্বাধীন হয়েছি বলে তো আমরা এক হইনি। ঐক্যের অভাব আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তবে তার আকার প্রকার বদলেছে।”

নেপালদা বললেন, “কিন্তু ওসব পুরোনো কান্ডনদী ঘেঁটে কী হবে। শুনীতল যে প্রশ্ন তুলেছে তার উত্তর কই? বজ্রা ও ভূমিকম্প কি এই দেশটাকেই ইজারা নিয়েছে? বেছে বেছে এই দেশেই হয়? পাকিস্তানের লোক পেট ভরে খেতে পায়, আমরা কেন পাইনে?”

অধ্যাপক বললেন, “সেইজন্মেই তো বলছি অত অধীর হলে চলবে কেন! অসময়ে স্বাধীন হয়েছ, দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করেছ, অত্যাচারের লেশমাত্র লক্ষণ নেই, তোমাদের অন্নভাব হবে না তো হবে কার! কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলো পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে, তাই ওরা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলো তোমাদের ভাগে, তাই তোমরা ওদের চেয়ে অগ্রসর।”

নেপালদা বললেন, “কাপড় উধাও। কাগজ অদৃশ্য। সব জিনিসের দাম আগুন। অতএব আমরা অগ্রসর।”

অধ্যাপক বললেন, “ওদের চেয়ে অগ্রসর। ওদের তুলনায় অগ্রসর।”

শুনীতল বলল, “অগ্রসর হয়েছি বলে কি অনাহারে মরব? এই আমার প্রশ্ন।”

অধ্যাপক বললেন, “না, অনাহারে মরবে কেন? আমেরিকা থেকে

প্রত্যয়

গম আসছে, ইরাক থেকে খেজুর এসেছে। পাকিস্তানের সঙ্গেও চুক্তি হয়েছে, ওরা খাদ্য পাঠাবে।”

সুশীতল বলল, “তা সত্ত্বেও মফঃস্বলের বাজারে ধান চাল আক্রা। এখন থেকে এই। ভাদ্র আশ্বিনে মানুষ কী খেয়ে বাঁচবে? আগে বাঁচলে তো তার পরে অগ্রসর হবে?”

অধ্যাপক নাথায় হাত দিয়ে বললেন, “কঠিন প্রশ্ন। তবে আমার বিশ্বাস আমেরিকা কিছু পাঠালে রাশিয়াও কিছু পাঠাবে। চীন ইতিমধ্যে পাঠিয়েছে।”

নেপালদা হেসে বললেন, “নিরপেক্ষ থাকছি কি মাধে! গাছেরটা খাচ্ছি, তলারটা কুড়োচ্ছি। ছুনিয়ার লোক আমাদের চাঁদা করে খাওয়াবে। আমরা কোনো দিকে ঝুঁকব না। দাড়িপাল্লা সমান রাখব।”

সুশীতল বলল, “কিন্তু রাশিয়া যদি কিছু না পাঠায় তা হলে আমেরিকার কাছ থেকে কিছু নেওয়াটা কি উচিত হবে? নিলে মনের ঝোঁকটা কি মার্কিনের দিকে যাবে না?”

অধ্যাপক বললেন, “কতকটা। তবে তার ফলে আমাদের নিরপেক্ষতার ইতিবিশেষ হবে না। তেমন যদি দেখি তো খাদ্য আমদানি বন্ধ করে দেব।”

নেপালদা বললেন, “তার পরে অনশন।”

অধ্যাপক বললেন, “কেন, অনশন কেন। দামোদর পরিকল্পনা, রাফি পরিকল্পনা সমাপ্ত হলে খাদ্যের অনটন থাকবে না। অনাবাদী

প্রত্যয়

জমিব আবাদ হবে। ভালো গোক, ভালো সার, ভালো বীজ, এবং প্রত্যেকটির উপযুক্ত জোব দেওয়া হচ্ছে। সময় দাও, মৌনা ফলবে।”

বিনু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। নেপালদা বললেন, “বিনু, তুমি নীরব যে।”

বিনু বলল, “আমি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।”

শুশীতল বলল, “কী নিয়ে বোঝাপড়া?”

বিনু বলল, “সে অনেক কথা। তোমাদের যদি দৈব থাকে তা হলে শোনতে পারি। কিন্তু দৈব থাকবে না, ঠিক জানি।”

অধ্যাপক বললেন, “আমি বাবা দেব না, তুমি বলে যাও।”

নেপালদা বললেন, “আমি যদি বাবা দিই সেটা দৈবতানি বজ্র নয়, কোরহলেব জন্তে। আমাকে ভালো করে না বোঝালে আমি কিছু বুঝতে পারিনে। বুদ্ধিগুদ্ধি কম।”

শুশীতল বলল, “আমি যদি বাবা দিই সেটা তর্কবিতর্কের নিয়ম অনুসারে। বিনা বিচারে আমি কিছু মেনে নিতে পারিনে।”

বিনু বলল, “আচ্ছা, তা হলে শোন। চাষারা যে ফসল লাগে তাই বিনিময়ে তাবা পায় টাকা। টাকার বিনিময়ে পায় কাপড়চোপড় ছাতাছুতো আয়নাচিকিৎসা ঘটিবাটি হাড়িপাতিল তেল তুন লকড়ি। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এসব জিনিস পাওয়া আজকাল কঠিন। সেইজন্তে তাবা বলে, আরো টাকা দাও। আবার টাকা পেলে আশা করে আরো জিনিস পাবে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আরো টাকা ছড়ালে আবারো দাম বাড়বে, জিনিস যা পাওয়া যাচ্ছে তার বেশী পাওয়া যাবে না।

প্রত্যয়

একে তো উৎপাদন কম, তার উপর গ্রামের চেয়ে শহরের ক্রয়শক্তি বেশী, সুতরাং বেশীর ভাগ জিনিস শহরের ভাগে পড়ছে। শহরের সংখ্যা ও শহরের লোকসংখ্যা বহুগুণ হয়েছে। সুতরাং শহর যা কিনে রাখছে তাব পরে গ্রামেব কেনবাব যোগ্য জিনিস সামান্যই অবশিষ্ট থাকছে। সেই সামান্য জিনিস পড়ছে গ্রামেব ভাগে। চাষী দেখছে সে যা দিচ্ছে তাব তুলনায় সে যা পাচ্ছে তা অত্যন্ত কম। যদি দ্রব্যবিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকত তা হলে চাষী কিছুতেই এত কম জিনিসের বদলে এত বেশী ধানচাল ছাড়ত না। মুদ্রাবিনিময় প্রথার কাবসাজিতে ভুলে সে কাঁচের দামে কাঞ্চন ছাড়ছে।”

সুশীতল বলল, “এবার আমাকে বাধা দিতে হবে।”

বিহু বলল, “আগে সবটা শোন। প্রথম কয়েক বছর ওবা খুব লাভ করেছিল। কিন্তু বতই দিন যাচ্ছে ততই ওদেব লোকসান হচ্ছে। ওরা ঠকে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পাবছে না কেন ঠকে, কে ঠকাচ্ছে। টকাচ্ছে শহর। হাতীর মতো তাব খোবাক। উপরন্তু হাতীর মতো তাব হাওদা চাই, সজ্জা চাই। গ্রামগুলো যেন পিপড়ে আর শহরগুলো যেন হাতী। পিপড়ের মুখেব গ্রাস যাচ্ছে হাতীব পেটে, অথচ হাতী তাব বদলে ছাড়ছে না পিপড়ের সাজপোষাক। পিপড়ে আশা করেছিল দেশ স্বাধীন হলে তার বরাত কবে যাবে, কিন্তু শাদা হাতীব বরং কালো হয়েছে বলে তাব খোরাক তো কমেনি, পোষাক তো কমেনি, বরং কিছু বেড়েছে। কালো হাতী যদি হোলি খেলতে খেলতে লাল হাতী হয় তা হলেও তার খোরাক কমবে না, পোষাক কমবে না,

প্রত্যয়

বরং আরো বাড়বে। পিপীলিকার অতীত অঙ্ককার, বর্তমান অঙ্ককার, ভবিষ্যৎ অঙ্ককার। সে যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থাকবে। যদি না—”

সুশীতল বাধা দিয়ে বলল, “যদি না পিপড়েরা হাতী হয়ে ওঠে।”

বিহু নীচু গলায় বলল, “অথবা হাতীরা পিপড়ে।”

নেপালদা গরম হয়ে বললেন, “হাতী কখনো পিপড়ে হয় না। হতে পারে না।”

অধ্যাপক সায় দিয়ে বললেন, “ইতিহাসে নজির নেই।”

বিহু বলল, “নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে।”

সুশীতল তর্ক করল, “সভ্য মাহুষের ইতিহাস, না অসভ্য অর্ধসভ্য মাহুষের?”

বিহু বলল, “আমিও সে কথা ভাবছি কিছু দিন থেকে। সেইজন্তে জোর গলায় এসব কথা বলছি। দেখছি দেশ এখনো মধ্যযুগের মায়ী কাটাতে পারছে না। গান্ধীবাদী বন্ধুরা পল্লীগ্রামে চরকার পুনঃপ্রবর্তন করতে গিয়ে লক্ষ করছেন জাতিভেদ পুনঃপ্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যদি জাতিভেদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা হবে না। হবে পুরাতন ইতিহাসের রোমন্থন। মতুসংহিতার সমাজ ফিরে আসবে, যে যার জাতব্যবসা নিয়ে থাকবে, অসবর্ণ বিবাহ চলবে না, এই যদি হয় বিকেন্দ্রীকরণের পরিণাম তা হলে আমাদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে, আমাদের নতুন কিছু দেবার নেই, আমরা প্রাচীনকালের ফসিল। আমি যে নতুন

প্রত্যয়

সমাজের স্বপ্ন দেখতে চাই সে সমাজে জাতিভেদ থাকবে না, মানুষকে জন্ম অনুসারে ভাগ করা হবে না। কে বামুনের ছেলে, কে বাগদির ছেলে কেউ জানবেও না, কেউ জানাবেও না। তা যদি না হয় তবে কাজ নেই বিকেন্দ্রীকরণে। শহরগুলো আছে বলে তবু আধুনিক যুগের হাওয়া গায়ে লাগছে। আমি আমার দেশকে যেমন ভালোবাসি তেমনি ভালোবাসি আমার যুগকে। দেশ আমার জননী, যুগ আমার জনক।”

স্বশীতল খুশি হয়ে বলল, “তা হলে তুমি আমাদের দিকে।”

বিহু বলল, “যুগ সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন আমি তোমাদের দিকে। কিন্তু দেশ সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন গান্ধীবাদীদের দিকে। আমি আধুনিক যুগ থেকে আরো আধুনিক যুগে যেতে চাই, সেই সঙ্গে শহর থেকে যেতে চাই গ্রামে।”

নেপালদা বললেন, “কী করে সেটা সম্ভব?”

অধ্যাপক বললেন, “পিছু হটেতে হটেতে কেউ সামনের দিকে এগোতে পারে?”

বিহু বলল, “সেইজন্তেই তো নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি। ভাবছি এখন বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলব না। বললে হয়তো দেশের লোক মনু পরাশরের যুগে ফিরে যেতে চাইবে। মনু পরাশর তাঁদের যুগের জন্তে যেসব আইন করেছিলেন এরা শুনছি নিজেদের যুগের জন্তে সে সব আইন বলবৎ রাখবে। যারা সব সময় পিছন পানে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে তাদের কাছে যদি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি তা হলে

প্রত্যয়

তারা বুঝবে না যে এটা নতুন সমাজের স্বরে বাঁধা। আগে তারা আধুনিক হোক, তার পরে তাদের শোনাব আধুনিকতর সমাজের কথা।”

নেপালদা বললেন, “কিন্তু কথায় কথায় আমরা মূল প্রশ্ন থেকে সরে এসেছি। কেন আমরা খেতে পাচ্ছি, এই আমার প্রশ্ন। এর কী উত্তর?”

বিহু বলল, “এর উত্তর চাষীরা টের পেয়েছে যে বিনিময়ের বাজারে তারা ঠকে যাচ্ছে। তাই আর মন দিয়ে চাষ করছে না। উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ভালো সার, ভালো বীজ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। লাভের আশা না থাকলে কেন তারা পয়সা খরচ করবে? বিনা মূল্যে সরবরাহ করলে ফসল বাড়তে পারে। জলসেচ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কেউ কি দাম দিয়ে দামোদরের জল নেবে? নেবে, যদি বিনামূল্যে পায়। মোট কথা চাষীকে সব রকমে সাহায্য করতে হবে। তা হলে ফসল বাড়বে।”

নেপালদা বললেন, “কিন্তু সরকারের এত টাকা কোথায়?”

বিহু বলল, “অগ্রাণু খাতে খরচ কমাতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে জমিদারি হাতে নিতে হবে। যে টাকাটা জমিদারের ঘরে যাচ্ছে সেটা সরকারের ঘরে যাবে। সেখান থেকে চাষীর ঘরে।”

অধ্যাপক বললেন, “কিন্তু খেসারৎ?”

বিহু বলল, “খোসারৎ নয় পেনসন। তাতে যদি ওরা নারাজ হয় তা হলে দেশের লোককে খাওয়ানোর ভার ওদের হাতেই তুলে দাও। ওরাই গবর্নমেন্ট গঠন করুক। কিছুদিন চালিয়ে দেখুক চলে

প্রত্যয়

কি না। ওদের দায়িত্বহীনতার দাওয়াই হচ্ছে ওদের হাতে শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা।”

অধ্যাপক বললেন, “কিন্তু ওটা কি গণতন্ত্র সম্মত হবে?”

বিহু বলল, “নাই বা হলো। শ্রাম রাখব, না কুল রাখব?”

স্বশীতল খুশি হয়ে বলল, “এই যে তুমি দেখছি আমাদের দিকে।”

বিহু বলল, “তোমরা কি এ বিষয়ে একমত?”

নেপালদা বললেন, “আরে না, না। তা কি হয়!”

অধ্যাপক বললেন, “ওটা গঠনতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্র বিরোধী।”

বিহু হেসে বলল, “আমি জানতুম। সোজা রাস্তা নেই, স্বশীতল। খাণ্ডসবুট দিন দিন আরো তীব্র হবে। আমেরিকার কাছে চাঁদা করে, রাশিয়ার কাছে চাঁদা করে যত দিন চলে চলবে। তার পর হয় অন্তঃপরিবর্তন, নয় বড় রকম একটা বিপ্লব।”

স্বশীতল উল্লাসে অধীর হয়ে বলল, “তার মানে বিপ্লব। তুমি আমাদের দিকে।”

বিহু হেসে বলল, “বিপ্লব মানে তো লাল হাতীর তাণ্ডব। পিঁপড়েরা হাতীর পায়ে তলায় গুঁড়িয়ে যাবে যে।”

নেপালদা গম্ভীরভাবে বললেন, “এসব হাসি তোমাণার বিষয় নয়। জীবনমরণের প্রশ্ন। কাক্সা বাচ্চাদের নিয়ে যে কী কষ্টে আছি সে আমি জানি আর জানে আমার স্ত্রী; কোথায় আমাকে একটু আশ্বাস দেবে না লাল হাতীর তাণ্ডবের ভয় দেখাচ্ছ।”

অধ্যাপক বললেন, “না, না, ভয় দেখাবে কেন? আমার মনে হয়

প্রত্যয়

বিহু একটা কিছু হাতে রেখেছে, হাতে রেখে বলছে। সেইজন্তে অত হাসি। বিহু, বলো দেখি এর কোন সমাধান আছে কি না।”

বিহু বলল, “হাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। যদি আমার কথা মেনে নাও যে বিনিময়ে মুশকিল তা হলে বিনিময়েই আসান। বিনিময়টা যাতে চাষীর অন্তকূল হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। চাষীকে আরো টাকা না দিতে পারো আরো পণ্য জোগাও। তা হলে সে তোমাকে আরো অন্ন জোগাবে।”

অধ্যাপক বললেন, “টাকা যা দিচ্ছি তার বেশী দেওয়া যায় না।”

বিহু বলল, “তার মানে পণ্য যা দিচ্ছি তার বেশী দেওয়া যায় না। বেশ, তা হলে অন্ন বা পাচ্ছি তার বেশী পাওয়া যায় না।”

নেপালদা বললেন, “আমি কিন্তু বুঝতে পারলুম না।”

বিহু তাঁকে বুঝিয়ে বলল, “যে টাকা আপনি চাষীকে দিচ্ছেন সে টাকা দিয়ে সে কাপড় কিনছে মনে করুন। সে বলছে আরো টাকা দিন, তা হলে আরো কাপড় কিনব। আপনি বলছেন, না, আর টাকা পাবে না, আর কাপড় কিনবে না। তখন সে বলছে, আর কাপড় কিনব না তো আর ধান বেচব না। আপনি তা হলে যা খেতে পাচ্ছেন তার বেশী খেতে পাবেন না। এই যা পাচ্ছেন এও পাচ্ছেন প্রোকিওরমেন্টের কল্যাণে। প্রোকিওরমেন্ট না থাকলে এটুকুও পেতেন না। এই টাকায় এর বেশী পাওয়া তো দুর্ব্বন্দ্র কথা।”

নেপালদা বললেন, “তুমি তা হলে কী করতে বলো?”

বিহু বলল, “প্রোকিওরমেন্ট যদি রাখতে হয় তবে শুধু ধানচালের

প্রত্যয়

বেলা কেন? কাপড়চোপড় বাসনকোসনের বেলা কেন নয়? প্রোকিওরমেন্ট আছে বলে আপনার টাকার ক্রয়শক্তি যত হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী হয়েছে। তা হলে প্রোকিওরমেন্টকে আরো ব্যাপক করে চাষীর টাকার ক্রয়শক্তি আরো বেশী করুন। চাষীর আবশ্যক দ্রব্য প্রোকিওর করতে বলুন। বিনিময়ে সে যদি কিছু বেশী পায় তা হলে চাষবাস মন দিয়ে করবে। আরো ফসল ফলাবে। নিজের খাবে, আপনাকে খাওয়াবে।”

অধ্যাপক বললেন, “সর্বনাশ। কলকারখানায় প্রোকিওরমেন্ট! কলওয়ালারা পাড়া মাথায় করবে না? আকাশ ফাটাবে না?”

নেপালদা বললেন, “তা কি হয়!”

বিহু হেসে বলল, “হাতীর খোরাকের বেলা প্রোকিওরমেন্ট। পিপড়ের পোষাকের বেলা তা কি হয়!”

সুশীতল বলল, “এই হাতী পিপড়ের মামলা দেখছি সহজে মিটছে না।”

বিহু বলল, “না। সহজে মিটবে না। ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু ষাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। বিপদের মধ্যেই উদ্ধারের সঙ্কেত রয়েছে।”

অধ্যাপক বললেন, “এখন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যা বলতে চাও! চাষী যা উৎপাদন করেছে ও চাষীর জগ্রে যা উৎপাদন করা হচ্ছে উভয়ের মধ্যে একটা সমতা থাকা চাই। আজকের দিনে সেই সমতা ন হয়েছে। কিন্তু কেন নষ্ট হলো? কবে থেকে নষ্ট হলো?”

প্রত্যয়

বিহু বলল, “মুক্তাশ্রীতির দরুণ নষ্ট হলো। যুদ্ধের সময় থেকে নষ্ট হলো। যুদ্ধের গোড়ার দিকে চাষীর লাভ হচ্ছিল বলে সে টের পায়নি। শেষের দিকে সে ভাবতে আরম্ভ করে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সে দাবী করে কন্ট্রোল তুলে দাও। তার সে দাবী এখনো চাড়েনি। দেশে যদি বড় বড় শহর না থাকত, শহরের লোককে খাওয়ানোর দায়িত্ব না থাকত তা হলে চাষীর মুখ চেয়ে কন্ট্রোল উঠিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তার তো উপায় নেই।”

অধ্যাপক বললেন, “কন্ট্রোল উঠে গেলে সর্বনাশ।”

নেপালদা জাঁতকে উঠলেন। “আবার মন্বন্তর হবে।”

স্বশীতল ঘাড় নড়ল। “না, অত বড় ঝুঁকি আমরাও নেব না।”

বিহু বলল, “সমতা ফিরে না এলে যে দশা হবে সেটা তিলে তিলে সর্বনাশ, তিলে তিলে মন্বন্তর। সেটা যদি তোমাদের সহ্য হয় তা হলে আমার কিছু বলবার নেই।”

অধ্যাপক বললেন, “আমি কিন্তু ভাবছি মুক্তাশ্রীতির কথা। নষ্টের গোড়া যদি হয় ইনফ্লেশন তা হলে গোড়া ঘেঁষে ফোপ মারতে হবে। কন্ট্রোল উঠিয়ে দিয়ে কী হবে, ইনফ্লেশন বন্ধ করো। তা হলে দেখবে সমতা ফিরে এসেছে।”

বিহু বলল, “তার মানে কী জানো? তার মানে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হবে। সৈন্য দল ভেঙে দিতে হবে। এত পুলিশ থাকবে না। মাতুষের সঙ্গে মাতুষের সম্পর্ক হবে অহিংসার। বিরোধ যদি বাধে তবে তার মীমাংসা হবে অহিংস পদ্ধতিতে। এক পক্ষ তৈরি থাকবে মার

প্রত্যয়

খেয়ে মার ফিরিয়ে না দিতে। অথচ কাপুরুষের মতো নয়, ক্রীষের মতো নয়। দেশ যদি এর জন্তে তৈরি থাকত তা হলে মুদ্রাস্ফীতি এত দিনে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় সব দেশই তটস্থ। আমাদের দেশও।”

নেপালদা বললেন, “যুদ্ধের জন্তে প্রস্তুত না হয়ে উপায় নেই। উপায় যা ছিল তা গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়েছে। অহিংসার মর্বাদা বুঝত ইংরেজ, বুঝবে না পাকিস্তানী মুসলমান, বুঝবে না কোনো দেশের কমিউনিষ্ট। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর চাই। সৈন্যদলের খাতে ব্যয়সংক্ষেপ চলবে না। চলবে না পুলিশের খাতে।”

বিহু বলল, “তা হলে এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে! এই মুদ্রাস্ফীতির জলতরঙ্গ।”

নেপালদা বললেন, “হরে মুরারে। হরে মুরারে। কবে তিনি আসবেন? দেরি হচ্ছে কেন? কল্কী অবতারের।”

হুশীতল উৎফুল্ল হয়ে বলল, “তিনি আসবেন। তিনি আসবেন। আমাদের দল থেকে।”

নেপালদা সম্ভ্রান্ত ভাবে বললেন, “না, না। আমি গুরুত্বা ভেবে বলিনি। আমি ধর্মপ্রাণ হিন্দু।”

হুশীতল বলল, “ধর্মের যুগ গেছে। যে অধর্ম নিজের চোখে দেখছি তার পরে আর ধর্মের কাহিনী কানে শুনতে চাইনে।”

অধ্যাপক বললেন, “যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ না করলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাবে না। মুদ্রাস্ফীতি রোধ না করলে কট্টোঁল তুলে দেওয়া চলবে না।

প্রত্যয়

কন্ট্রোল তুলে না দিলে চাষী যা উৎপাদন করে তার সঙ্গে চাষীর জন্তে যা উৎপন্ন হয় তার সমতা রক্ষা হবে না। সমতা রক্ষা না হলে চাষী মন দিয়ে চাষবাস করবে না। চাষী মন দিয়ে চাষবাস না করলে খাতি সঙ্কট দিন দিন আরো তীব্র হবে। মাহুষ এক দিনে মরবে না, তিলে তিলে মরবে। কেমন, ঠিক বলেছি তো?”

বিহু সায় দিল। “ঠিক বলেছি।”

অধ্যাপক বললেন, “কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা না করা ভারতের হাতে নয়। মার্কিনের হাতে, রুশের হাতে। তারা বন্ধ করবে বলে মনে হয় না।’

হুশীতল বলল, “রাশিয়া তো আপ্রাণ চেষ্টা করছে শান্তির জন্তে। যত দোষ আমেরিকার।”

অধ্যাপক বললেন, “শান্তির জন্তে নয়, সময়ের জন্তে। কিন্তু শোন আমার কথা। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা আমাদের হাতে নয়। তার জন্তে প্রস্তুত থাকতে হবে আর সকলের মতো আমাদেরও। তা যদি হয় তা হলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা আমাদের অসাধ্য। তা হলে কন্ট্রোল তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে কে? আমরা নিতে পারিনে। তা হলে সমতা রক্ষার জন্তে কী করতে পারি? হ্যাঁ, এইটেই প্রশ্ন।”

বিহু বলল, “চাষীর উৎপন্ন শুল্ক প্রোকিওর করার আগে চাষীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রোকিওর করতে পারো।”

নেপালদা বললেন, “অসম্ভব।”

বিহু বলল, “চাষীকে সব রকমে সাহায্য করার জন্তে ছমিদারিগুলো

প্রত্যয়

হাতে নিতে পারে। যার জমি নেই তাকে বিনা সেলামিতে জমি দিতে পারে।”

নেপালদা বললেন, “অভাবনীয়।”

বিহু বলল, “শহরগুলোর লোকসংখ্যা অর্ধেক কমাতে পারে। দয়াকরী কাজ করছে না এমন লোক দেখলেই শহরের বাইরে চালান দিতে পারে।”

নেপালদা বললেন, “অকল্পনীয়।”

বিহু বলল, “বেকার বা অলস লোক দেখলেই চরকা কাটতে, ঘানি ঘোরাতে, দড়ি পাকাতে, জাল বুনতে বাধ্য করতে পারে। তা হলে চাষীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহু পরিমাণে উৎপন্ন হবে, সে তার উৎপন্ন শস্যের উপযুক্ত বিনিময় পাবে।”

নেপালদা বললেন, “অকার্যকর।”

বিহু বলল, “প্রত্যেকের বাড়ীতে আলাদা রান্না করলে কিছু না কিছু অপচয় হয়। পাড়ার দশখানা বাড়ীর লোক পালা করে পরস্পরের জন্তে রান্নাধাণে অপচয় হয় না, খাওয়া বাঁচে। তার ফলে প্রোকিওরমেন্টের চাপ কমে। চাষী একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। চাষের উপর তার যেন্না ধরে যায় না।”

নেপালদা বললেন, “আঘাতে গল্প।”

বিহু বলল, “শহরের লোক যে যার বাড়ীর ছাতের উপর মাটির টবে অল্পসল্প শাকশব্জি ফলাতে পারে। যার উঠোন আছে সে

প্রত্যয়

উঠানে। ভাতের সাথ শাকসব্জিতে মেটে না, তবু কতকটা সুরাহা হয়। চাষীর উপর থেকে চাপ কমে।”

নেপালদা বললেন, “গাঁজাখুরি।”

বিশ্ব তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, “নেপালদা, যে মরবে বলে পণ করেছে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। খাচ্ছ আমদানি করে ক’দিন চলবে? আমদানি যেদিন বন্ধ হবে সেদিন সবাক্কে পটল উত্তোলন।”

নেপালদার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, “নারায়ণ! নারায়ণ!”

অধ্যাপক বললেন, “সমতা রক্ষার কথাই ভাবছিলুম। যেমন করে হোক সমতা রক্ষা করতে হবে। চাষীকে ধাপ্লা দিয়ে, তার উপর জোর জোর জুলুম করে সোভিয়েট রাশিয়ায় ওরা একটা সমাধান করেছে, তা বলে আমরাও যদি তাকে ধাপ্লা দিই, তার উপর জোর জুলুম করি, তা হলে তার মন ভেঙে যাবে, সে যন্ত্রের মত কাজ করতে করতে যন্ত্র বনে যাবে। আর আমরাও আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে বসব। কন্ট্রোলের খোরাক খেতে খেতে যে খেতে দিচ্ছে তার কন্ট্রোলে বাস করব। না, ভায়া, এ অবস্থা বেশী দিন চলতে দেওয়া ঠিক নয়। দেশের লোকপেটের দায়ে যে কোনো একজন ডিকটেটরের পায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকিয়ে দেবে। সে যদি হয় বিদেশী ডিকটেটর তা হলে কেবল ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন।”

স্বশীতল বলল, “এ আজাদী বুটা হৈ। থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী।”

প্রত্যয়

নেপালদা বললেন, “নির্বাচনের আর কত দেবি? আমিও এবার দাঁড়াব। হয় আমাকে খাদ্য দাও, নয় আমাকে ভোট দাও। হয় ভোট, নয় মৃত্যু।”

অধ্যাপক চিন্তাশ্রিত হলেন। তাঁকে বলতে শোনা গেল, “সমতা বক্ষা করতে হবে। ব্যালাঙ্গ ফিরিয়ে আনতে হবে। নতুবা—নতুবা গণতন্ত্র থাকবে না, গঠনতন্ত্র টিকবে না। স্বাধীনতা বিপন্ন।”

(১৯৫১)



